
জানবার কথা
সাত
SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BAN.PUR.



জানবার কথা

সপ্তম খণ্ড

জানবার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

সাক্ষর
লি মি টে ড

॥ প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর,১৯৫৪ ॥

প্রকাশক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি, চৌরঙ্গী টেরাস, কলকাতা ২০ ॥ মুদ্রাকর : নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না প্রেস লিমিটেড, ৩৭২, রসা রোড সাউথ, কলকাতা ৩৩ ॥ বাঁধিয়েছেন : ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ ১০০, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ ॥ গণশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ॥ ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি, ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা ৯ ॥

যাঁরা ব্লক তৈরি করেছেন : অমৃতলাল দাস, প্রফুল্ল বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস। যাঁরা শিসের হরফ সাজিয়েছেন : সুকুমার দত্ত, প্রশান্ত নিয়োগী, বিশ্বনাথ মৈত্র, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, ভোলানাথ চক্রবর্তী, সুধীর সাহা। যাঁরা ছাপার যন্ত্র চালিয়েছেন : নারায়ণ দাস, গৌরহরি স্বর্ণকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুদেব দে। যাঁরা বই বাঁধিয়েছেন : আব্দুল হামিদ মিয়া, অনিলচন্দ্র বসাক, গৌরীশঙ্কর দত্ত।

॥ দাম : প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা ॥

পরিবেশক : বেঙ্গল পাব্লিসার্স,
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জানবার কথা

॥ লিখেছেন ॥

অশোক ঘোষ
চিন্মোহন সেহানবীশ
জগদীশ দাশগুপ্ত
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রভাত দাশগুপ্ত
প্রশান্ত সান্যাল
মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রমাকৃষ্ণ মৈত্র
শ্যামল চক্রবর্তী
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

॥ ছবি এঁকেছেন ॥

অমূল্য দাশ
জ্যোৎস্না ঘোষ-দস্তিদার
প্রবীর দাশগুপ্ত
হরনারায়ণ দাশ

॥ প্রচ্ছদপট ॥

খালেদ চৌধুরী

॥ উৎসর্গ ॥

যারা ছনিয়াকে জেনে ছনিয়াকে বদলাবে
যারা আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে
নতুন ভবিষ্যৎ যারা মুঠোয় আনবে
আমাদের দেশের সেই ছোটো ছোটো
ছেলেমেয়েদের
উদ্দেশে



খবরের কাগজের খবর

জোর খবর, জোর খবর, জোর খবর—

কাগজওয়ালা তারস্বরে চিৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছে। প্রায়ই শুনি। আর শুনলেই একটা কাগজ কিনে পড়ে দেখি।

সেদিন কিন্তু আমার মাথায় কী রকম নতুন ধরনের একটা খেয়াল চাপলো। ভাবলাম, খবরের কাগজে যে-সব খবর ছাপা হয় সেগুলো তো রোজই পড়ছি। কিন্তু খবরের কাগজের খবরটা আজো পর্যন্ত কিছুই জানা হলো না।

খবরের কাগজের খবর মানে?

খবরের কাগজে কীভাবে বা কাদের হাত দিয়ে খবরগুলো আসে? খবরের কাগজের দপ্তরে যারা কাজ করে তাদের কাজ-গুলো কেমন ধরনের? যে ছাপার যন্ত্রে ঘণ্টায় হাজার হাজার কাগজ ছেপে বার হচ্ছে সেগুলোই বা কেমন? দুপুর রাতের খবর যে ভোর না-হতেই ছাপা হচ্ছে—এতো তাড়াতাড়ি সেগুলো

কাগজ-ছাপার যন্ত্র পর্যন্ত পৌঁছচ্ছেই বা কী করে?

মাথায় এই সব নানান প্রশ্ন নিয়ে একদিন সরাসরি এক বড়ো খবরের কাগজের দপ্তরে গিয়ে হাজির হলাম। ম্যানেজারকে বললাম, আমার সব প্রশ্ন। তিনি আমাকে "নিউজ এডিটর"-এর কাছে যেতে বললেন: 'তিনি আপনাকে খবরের কাগজের সব 'নিউজ' বলে দেবেন। তবে তিনি খুব ব্যস্ত লোক, অল্প কথায় প্রশ্ন করবেন, আর আপনার কাজ শেষ হলেই দয়া করে তাঁকে তাঁর কাজে ছেড়ে দেবেন।'

নিউজ এডিটর। বাঙলায়, বার্তা-সম্পাদক। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা যে রোজ এতো ঝুড়ি ঝুড়ি খবর ছাপেন, সে-সব খবর জড়ো করেন কোথা থেকে?

'আমরা খবর জোগাড় করি নানান উপায়ে।

'প্রথমত, আমার ডান পাশের এই বাক্সটা থেকে। এই বাক্সটার নাম—' আগে বাক্সটাকে লক্ষ্য করি নি। চোখ ফেলতেই শুনলাম—বাক্সটার ভেতর থেকে কেমন একটা শব্দ বেরোচ্ছে—টাইপরাইটারের শব্দের মতো। আর বাক্সটার পিঠ বেয়ে অনেকখানি কাগজ ঝুলে আছে। '—এই বাক্সটার নাম টেলিপ্রিণ্টার। এই মেশিনে খবর টাইপ হয়ে আসে। এই দেখুন —' বলে তিনি মেশিন থেকে খানিকটা কাগজ ছিড়ে আনলেন। দেখলাম, কাগজে ইংরেজিতে টাইপ-করা নানান খবর।

জিজ্ঞাসা করলাম, টেলিপ্রিণ্টারে কী করে খবরগুলো আসে?

বার্তা-সম্পাদক বললেন, ভারতবর্ষে পি.টি.আই. বলে একটা কোম্পানি আছে। ভারতের সব বড়ো বড়ো শহরেই তাদের

দপ্তর আছে, খবর জোগাড় করে আনার জন্যে কর্মচারী আছে। ভারতের যেখানেই যা ঘটছে পি.টি.আই.-র লোকেরা তা তাদের দপ্তরে পৌঁছে দিচ্ছে। সব দপ্তরের খবর দিল্লীর সদর দপ্তরে গিয়ে জমা হয়। দিল্লী থেকে সেই সব খবর ভারতের সব শহরের সব খবরের কাগজের অফিসে পৌঁছে যাচ্ছে।

কিন্তু বিদেশের খবর? ফ্রান্সের খবর তো আর পি.টি.আই. ভারতে বসে পেতে পারে না!

ঠিকই বলেছেন। বিদেশী খবর এনে দেয় আরেকটা কোম্পানি। তার নাম রয়টার। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তার দপ্তর আছে। পি.টি.আই. রয়টার মারফত বিদেশী খবর জোগাড় করে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

এ ছাড়া আরো এক উপায়ে আমরা খবর জোগাড় করি। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের সদর শহরে, বাঙলাদেশের নানান শহরে আর গ্রামে আর এই কলকাতা শহরেই আমাদের নিজেদের অনেক কর্মী আছেন। তাঁরাও আমাদের কাছে খবর পাঠান।

এই হলো খবর জোগাড়ের মোটামুটি খবর।

এই সব খবরগুলোকে আমরা বাছাই করি, ভাষার ঘষা-মাজা করি, কাটছাঁট করি, খবরগুলোর মাথায় দরকারমতো ছোটো-বড়ো হেডিং বসাই। এই সব কাজে আমাকে সাহায্য করেন সাব-এডিটর বন্ধুরা: বাংলায় তাঁদের সহকারী সম্পাদক বলে।

খবরগুলো পাকাপাকিভাবে লেখা হলে লাইনো-ঘরে যায়।

লাইনো-ঘর কী ?

লাইনো হলো ছাপার হরফ কম্পোজ করার মেশিন। খবরের কাগজে সব খবর চটপট কম্পোজ করে ফেলতে হয়। সাধারণ ছোটো ছাপাখানায় যেমন হাতে করে হরফ গাঁথা হয় খবরের কাগজে তেমনভাবে হরফ গাঁথতে হলে আর দুপুর রাতের খবর ভোর না-হতেই ছেপে বের করে দেওয়া যায় না।

টাইপরাইটারে যেমন হরফের চাবি টিপতে হয়, লাইনো মেশিনেও তেমনি হরফের চাবি টিপতে হয়। টাইপরাইটারে চাবি টিপলেই কাগজে ছাপ পড়ে, লাইনো মেশিনে ছাপটা পড়ে সিসের একটা সরু পাতের ওপর। সাধারণ ছাপাখানায় হাতে গাঁথার প্রত্যেকটি হরফ আলাদা একটা একটা টুকরো; লাইনো মেশিনের হরফগুলো কিন্তু একটা আস্ত সিসের পাতের ওপর গাঁথা, অর্থাৎ এক-একটা লাইনই সিসের এক-একটা আস্ত পাত।

লাইনো মেশিনে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়। মোটামুটি হিসেবে বলা যায়, একজন মাঝারি লাইনো অপারেটর চারজন ভালো কম্পোজিটরের সমান কাজ করেন।

খবরগুলো লাইনো-ঘর থেকে কম্পোজ হয়ে এলে, টুকরো টুকরো খবরগুলোকে সাজিয়ে এক-একটা করে পাতা তৈরি করে ফেলা হয়।

খবরের কাগজ যে-মেশিনে ছাপা হয় তার নাম রোটারি। পঞ্চম খণ্ডের ছাপাখানার কথা মনে আছে তো? সাধারণ যে-যন্ত্রে বই ছাপা হয় তাকে বলে ফ্ল্যাট-বেড্—তার টাইপ-বেডটা একটা

সমতল জায়গায় শুয়ে থাকে আর কাগজটা তার ওপর চাপ খেয়ে ঘুরে যায় একটা সিলিণ্ডারে চেপে। এর সঙ্গে রোটারি মেশিনের তফাত হলো, রোটারির বেলায় টাইপ-বেডটাও আটকানো রয়েছে সিলিণ্ডারের গায়ে। টাইপ-বেড কী করে সিলিণ্ডারের গায়ে আটকানো যেতে পারে? প্রথমে কম্পোজ করা হলো, পাতা হিসেবে সিসের হরফ সাজিয়ে নেওয়া হলো, তারপর এই হরফের ওপর একটা পিজবোর্ড রেখে ওপর থেকে জোর চাপ দেওয়া হলো। ফলে পিজবোর্ডটার গায়ে টাইপের ছাপ ফুটে উঠলো। তারপর, সেই পিজবোর্ডকেই ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে একটা খুব নরম আর পাতলা ধাতুর পাতের ওপর আবার তার ছাপ ফুটিয়ে নেওয়া হলো। এরপর ওই পাতলা ধাতুর পাতটাকে গোল করে সিলিণ্ডারের গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হবে—সিলিণ্ডারের গায়ে সেটাই টাইপ-বেড হিসেবে আটকে থাকবে। সিলিণ্ডারের গায়ে এইভাবে টাইপ-বেড আটকে নিতে পারবার সুবিধে হলো, ছাপা হয় দারুণ তাড়াতাড়ি : সিলিণ্ডারটা বনবন করে ঘুরে চলবে আর কাগজের রোল থেকে কাগজ বেরিয়ে হুহু করে ছাপা হয়ে যাবে।

এইভাবে তাড়াতাড়ি ছাপা সম্ভব হয় বলেই রাত তিনটেয় ছাপতে শুরু করেও ভোর হতে না-হতেই তোমার জন্যে তাজা খবরের কাগজ ছাপিয়ে বের করে দেওয়া যায়।

কিন্তু খবরের কাগজ তো আর শুধু আমাদের মতো কলকাতা শহরের লোকদের জন্যেই ছাপা হয় না। মফঃসলে কাগজের আপিস নেই; কলকাতা থেকে কাগজ ছাপিয়ে মফঃসলে পাঠানো হয়।

তার ব্যবস্থাও কাগজের আপিসে গিয়ে দেখতে পেলাম। ধরো, ভোর রাতে একটা ট্রেন ছাড়বে ; সেই ট্রেন যে-সব মফঃসল হয়ে যাবে সেই সব মফঃসলের জন্যে হিসেবমতো কাগজ ছাপিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে। তাহলে, মফঃসলের কাগজগুলোকে একটু আগে আগে ছাপিয়ে নেওয়া দরকার—কলকাতার জন্যে কাগজ ছাপা হবে সব শেষে। কলকাতার সংস্করণের তুলনায় মফঃসল সংস্করণের কিছুটা তফাত তাই থাকতে বাধ্য। কলকাতার সংস্করণের তুলনায় মফঃসল সংস্করণের কাগজে কিছুটা বাসি খবর। সাধারণত, মফঃসল সংস্করণের ওপর পরের দিনের তারিখটা বসিয়ে দেওয়া হয় ; কেননা মফঃসল সংস্করণ মফঃসলে পৌঁছবে পরের দিন।

কিন্তু খবরের কাগজে তো শুধুই পৃথিবীর খবর ছাপা হয় না। তা ছাড়াও আরো নানান রকম জিনিস ছাপা থাকে। বিজ্ঞাপন থাকে, ছবি থাকে, সম্পাদকীয় থাকে, সাধারণত রবিবার-রবিবার গল্প-কবিতাও থাকে। খবরের কাগজের আপিস ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম, এই জাতীয় প্রত্যেকটি বিষয় যাতে কাগজে ঠিকমতো ছাপা হয় তার জন্যে আলাদা-আলাদা বিভাগ রয়েছে। বিজ্ঞাপন বিভাগে ব্যবসাদাররা বিজ্ঞাপন পাঠাচ্ছে, বিজ্ঞাপনটা ছাপিয়ে দেবার জন্যে টাকাকড়িও পাঠাচ্ছে। কবে কোন পাতায় কী বিজ্ঞাপন ছাপা হবে তার বিলিব্যবস্থা করতে বিজ্ঞাপন বিভাগ নিদারুণ ব্যস্ত।

তেমনি আবার, রবিবারের পাতায় গল্প-কবিতা বা সেই রকম আরো রকমারি বিষয় ছাপাবার বিলিব্যবস্থা করছেন সেই

বিভাগের কর্মীরা।

এই সব দেখাশুনোর পর ভাবলাম, একবার সম্পাদকের রকম-সকমটা দেখে আসা যাক। ঢুকে পড়লাম তাঁর ঘরে। ঢুকে দেখি, দারুণ ব্যস্তসমস্ত মানুষ—সম্পাদকীয় লিখতে ব্যস্ত। সম্পাদকীয় মানে? ছুনিয়ায় যে-সব ঘটনা ঘটছে তার ওপর মন্তব্য আর কি।

হয়তো, ফরাসী দেশের মন্ত্রীরা একটা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবরটা কাগজে আজ ছাপা হয়েছে, বা কাল ছাপা হবে। সম্পাদক মশাই খুব কড়া করে লিখছেন, ফরাসী মন্ত্রীদের পক্ষে এটা মোটেই উচিত কাজ হয় নি। কিংবা হয়তো, বজ-বজের তেল-মজুররা ধর্মঘট করেছে; সম্পাদক মশাই তেজস্বী ভাষায় লিখছেন কাজটা ঠিক হয়েছে বা হয় নি।

শুধোলাম, ছুনিয়ার নানা জায়গা থেকে রোজই তো মশাই রাশি রাশি খবর আপনার এখানে এসে পৌঁছোয়। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে জরুরী তারই ওপর আপনি নিশ্চয়ই আপনার সম্পাদকীয় লিখবেন। এখন, কোনটা জরুরী আর কোনটা জরুরী নয়—তা ঠিক করেন কীভাবে? কিংবা কোনটিকে ভালো বলবেন বা কোনটিকে মন্দ বলবেন, তাই বা ঠিক করেন কেমন করে? পাঁচটা কাগজ যদি এক সঙ্গে উলটে দেখি তাহলে দেখবো, পাঁচ রকমের সম্পাদকীয়। তার মানে, এ-সম্পাদকের সঙ্গে ও-সম্পাদকের মতের মিল নেই। কিন্তু তা কি শুধুই এ-সম্পাদকের এক রকম মর্জি আর ও-সম্পাদকের অন্য রকম মর্জি —এইটুকুই নাকি?

সম্পাদক মশাই বললেন, আসলে তা নয়। এক-একটা কাগজের এক-এক রকম পলিসি আছে।

পলিসি মানে?

মানে নীতি আর কি। আর নীতি বলতেও প্রধান কথাটা রাজনীতি নিয়েই। তার মানে, সব দেশেই রাজনীতির দল আছে। এক-একটা কাগজ সাধারণত এক একটা দলের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই সেই রাজনীতির দল এক-একটা ঘটনাকে যেভাবে বিচার করতে চায় তার সঙ্গে সংযুক্ত খবরের কাগজ সেই ঘটনাটিকে সেইভাবেই বিচার করবে।

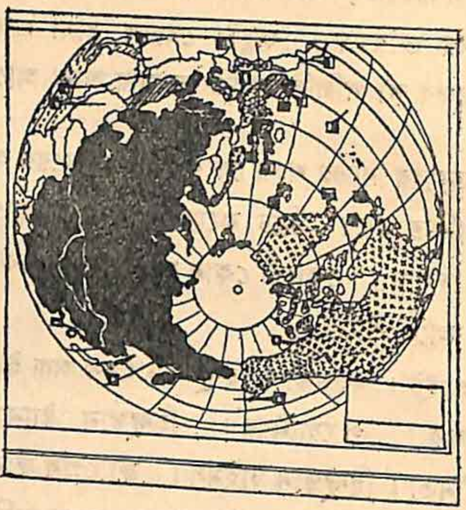
ব্যাপারটা বোঝা গেলো। একই ঘটনা নিয়ে কোনো কাগজ খুব উচ্ছ্বাস করছে আবার কোনো কাগজ দারুণ কড়া কড়া মন্তব্য করছে—তার কারণ বিভিন্ন কাগজের বিভিন্ন নীতি। এই নীতি অনুসারে শুধুই যে সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে তাই নয়—খবর-গুলোকে বাছাই করবার ব্যবস্থাও হচ্ছে। কোন খবরটা সবচেয়ে জোর খবর হবে—সবচেয়ে বড়ো হরফে সবচেয়ে ফলাও করে খবরটাকে ছাপানো হবে—তাও নির্ভর করছে কাগজের নীতির ওপর। এমনকি, দরকার হলে, নিজেদের নীতির পক্ষে বেকায়দা-জনক খবরকে একেবারে উপেক্ষাও করা যেতে পারে বা ছোট্ট হরফে এমনভাবে ছাপানো যেতে পারে যে পাঠকের চোখে হয়তো পড়বেই না।

অর্থাৎ কিনা, খবরের কাগজটা যে পড়বে তার মতামতটা গঠন করবার ব্যাপারে খবরের কাগজ যথেষ্ট সচেষ্ট। খবরের কাগজ তাহলে শুধু খবরই দেয় না, জনমত গঠন করবার ব্যাপারে

অত্যন্ত জরুরী হাতিয়ারের মতোও। প্রতি দিন হাজার হাজার খবরের কাগজ হাজার হাজার পাঠকের মনে কতকগুলি ধারণা গেঁথে দেবার চেষ্টা করছে। খবরের কাগজ সম্বন্ধে এই খবরটাও খুব কম জরুরী নয়। তাহলে খবরের কাগজ পড়বার সময় ও-বিষয়েও কিছুটা খেয়াল রাখা মন্দ কথা নয়। কোন কাগজের কী পলিসি তা কি তোমার জানা আছে?

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়। নিচে কয়েকটি খবরের কাগজের নাম দিলাম। কোনটি কোন শহর থেকে প্রকাশিত হয় বলতে পারো?

সার্চলাইট। বসুমতী। হিন্দু। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া। যুগান্তর। পায়োনিয়র। হিন্দুস্থান ষ্ট্যানডার্ড। স্বাধীনতা। হিন্দুস্থান টাইমস। ফ্রী প্রেস জার্নাল। অমৃতবাজার পত্রিকা। ষ্টেটসম্যান। বম্বে ক্রনিকল্।



এবার শুরু করবো আর একটা সমস্যা নিয়ে। খবরের কাগজ পড়ে পৃথিবীর খবরটা ঠিকমতো বুঝতে গেলে হাঙ্গামা বাধে কতকগুলো নাম নিয়ে। সেই নামগুলোর ঠিক মানে যে কী, তা বোঝা না থাকলে খবরের কাগজের অনেক খবরই বোঝা যায় না। আজকাল খবরের কাগজে যে-সব নাম হামেশাই ছাপা হচ্ছে সেগুলোর মানে বলবার চেষ্টা করি।

জাতিসংঘ

খবরের কাগজের পাতায় প্রায় প্রতিদিনই তোমরা দেখো একটা কথা : U.N.O.। পুরো কথাটা হলো : United Nations Organisation। বাঙলায় একে জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রসংঘ বলে। জাতিসংঘ কী ও কেন?

নিউইয়র্ক শহরের শেষপ্রান্তে লেক সাক্‌সেস্ নামে এক পাড়া আছে। এখানেই জাতিসংঘের প্রধান কেন্দ্র ও দপ্তর। আজকের আমেরিকায় ঐ একটিমাত্র জায়গা যেখানে তুনিয়ার সব দেশের ও সব মতের লোক আসতে পারে। তবু সব দেশ বা রাষ্ট্র এখনও এর সভ্য নয়। কেননা, তাদের সভ্য হতে দেওয়া হয়নি। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী নতুন চীনকেও এখনও জাতিসংঘে তার আসন দেওয়া হয়নি।

জাতিসংঘের বয়স মাত্র ১০ বৎসর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। আমেরিকায় রাজধানী ওয়াশিংটনে ডাম্বারটন্-ওক্‌স্ পল্লীতে এক সভা হয়। যে পাঁচটি প্রধান রাষ্ট্র হিটলার-মুসোলিনি-তোজোকে পরাস্ত করার লড়াইতে অগ্রণী ছিলো তারা এসেছিলো সেই সভায়।

পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনা ও যুদ্ধ বন্ধ করাই ছিলো সভার লক্ষ্য। পরে সান-ফ্রান্‌সিস্‌কো শহরে পঞ্চাশটি রাষ্ট্র মিলে রচনা করলো জাতিসংঘের সনদ। সনদে ঘোষণা করা হলো, জাতিসংঘ দেশে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করবে। সকলের সমান অধিকার; সকল দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার; জাতিতে

জাতিতে বন্ধুত্ব; মিলেমিশে সকল সমস্যার সমাধান ও সকল জাতি ও রাষ্ট্রের মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার পবিত্র কর্তব্য জাতিসংঘ গ্রহণ করলো।

জাতিসংঘের সভ্যদের চাঁদায় এর খরচ চলে। আর চীনা, ফরাসী, ইংরাজী, রুশ ও স্প্যানিশ এই পাঁচটি প্রধান ভাষায় চলে আলোচনা, যদিও চিঠিপত্রের কাজ চলে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায়। বর্তমানে ৬০টি রাষ্ট্র জাতিসংঘের সভ্য।

॥ পতাকা ॥

নীল রঙের ওপর জলপাইয়ের দুটি শাখায় ঘেরা গোলাকার পৃথিবী —এই হলো জাতিসংঘের পতাকা। এই পতাকা যে-কোনো রাষ্ট্রের পতাকা থেকে আলাদা।

॥ কাজের ভাগাভাগি ॥

এতো বড়ো এক জাতিসংঘ চলে কী করে? আসলে জাতিসংঘের ছয়টি প্রধান অঙ্গ: সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও সেক্রেটারিয়েট। এদের প্রত্যেকের বিষয় কিছু-কিছু জানা দরকার।

॥ সাধারণ পরিষদ ॥

জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ হলো সাধারণ পরিষদ বা General Assembly। এখানে জাতিসংঘের প্রতিটি সভ্যের স্থান আছে।

প্রতিটি রাষ্ট্র পাঠায় পাঁচজন প্রতিনিধি যদিও প্রতি রাষ্ট্রের ভোট আছে একটি। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদের সভা বসে। যে প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার সিদ্ধান্ত করা হয় উপস্থিত সভ্যদের তিন ভাগের মধ্যে দুভাগের ভোট নিয়ে। অন্য বিষয়ে এক ভোটের তফাতেও সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে। দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা ; যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অস্ত্র হ্রাস করা ও দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে তা মিটমাট করা প্রভৃতি কাজ সাধারণ পরিষদের। অবশ্য, সাধারণ পরিষদ মাঝে মাঝে কমিটি বা কমিশন নিয়োগ করতে পারে কোনো কোনো প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্যে। এ-জাতীয় কমিটি বা কমিশন নেহাতই সাময়িক ; নির্দিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলেই সে-কমিশন ভেঙে দেওয়া হয়। এইজাতীয় কমিটি, কমিশন ইত্যাদির নাম সাময়িকভাবে খবরের কাগজের পাতায় ভিড় করে।

॥ নিরাপত্তা পরিষদ ॥

যারা ফ্যাসিজমকে পরাস্ত করেছিলো তাদের মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই জাতিসংঘের সনদে ও সকল সভ্যের নির্দেশে স্বীকার করা হয়েছে যে নিরাপত্তা পরিষদের ১১টি পদের মধ্যে ঐ পাঁচ প্রধানের পাঁচটি পদ পাকাপাকিভাবে থাকবে। অন্য ছয়টি রাষ্ট্রের নির্বাচন হয় সাধারণ পরিষদে। পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তাকে বাঁচিয়ে রাখাই হলো এই পরিষদের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। এই কারণে সারা বছরই এর অধিবেশন চলে। পনেরো দিনে একবার সভা ডাকতেই হবে।

পাঁচটি প্রধান শক্তির মতৈক্য হলো এর ভিত্তি। সকলকার সর্ববাদিসম্মত নীতিই হলো নিয়ম। পাঁচ প্রধান শক্তির মধ্যে একজনেরও ভিন্ন মত হলে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না। এই মত-ভেদ জানানোর প্রথাকে বলা হয় 'ভেটো' (veto)।

॥ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ॥

আঠারোটি রাষ্ট্র নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত। সাধারণ পরিষদ এদের নির্বাচিত করে। ইংরেজী নাম : Economic and Social Council। এই পরিষদ কেন ? ভালোভাবে বেঁচে থাকা, সকলের জন্যে কাজ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি, জাতি-ধর্ম-ভাষা-স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে মানুষের সম্মান, অধিকার ও স্বাধীনতাকে রক্ষা ও উন্নত করা ও এই-জাতীয় সমস্যার সমাধান করা এই পরিষদের উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছে।

গোটা পৃথিবীকে তিন অঞ্চলে ভাগ করে এই পরিষদ তিনটি উপ-পরিষদ বা কমিশন গঠন করেছে। সেগুলির আসল নাম খুব বড়ো বড়ো ; তাই সাধারণত কাজ চালাবার জন্যে আসল নামের আদ্য অক্ষর নিয়ে কয়েকটি ডাকনাম তৈরি করা হয়েছে। ইউ-রোপের জন্যে ECE (Economic Council for Europe), এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের জন্যে ECAFE (Economic Council for Asia and Far East) ও লাটিন আমেরিকার জন্যে ECLA। বলা হয়েছে যে, অনুন্নত দেশের উন্নতিসাধন করবে এই তিনটি কমিশন।

এই পরিষদের অন্যান্য কমিশনের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক শিশু রক্ষার জন্য জরুরী তহবিল (U.N.I.C.E.F.)। এর নাম আমরা খবরের কাগজের পাতায় দেখে থাকি।

॥ অছি পরিষদ ॥

গার্জেনের যেমন গার্জেন, অভিভাবকের অভিভাবক, তেমনি অভিভাবক-রাষ্ট্রের অভিভাবক হলো অছি পরিষদ। ইংরেজীতে বলে Trusteeship Council।

অভিভাবক-রাষ্ট্র আবার কী?

যুদ্ধে পরাজিত রাষ্ট্রের অধীন অনেক দেশ চলে এসেছে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকার শাসনে। এমনকি স্বেচ্ছায় এসেছে জাতিসংঘের অধীন কোনো রাষ্ট্রের শাসনে। যাদের শাসনে এলো তাদের বলা হচ্ছে অভিভাবক-রাষ্ট্র। এই সব অভিভাবক-রাষ্ট্রের দেখাশোনার ভার অছি পরিষদের। এতে আছে পাঁচ প্রধান শক্তি। আর শাসন করে বা করে না এই দুরকম রাষ্ট্রের সমান-সংখ্যক প্রতিনিধি।

॥ আন্তর্জাতিক বিচারালয় ॥

রাজনৈতিক প্রশ্ন বাদে জাতিতে জাতিতে মামলা হলে আইনের প্রশ্নের বিচার হয় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে। ইংরাজীতে এর নাম International Court of Justice। জাতিসংঘের কোনো আইনগত প্রশ্নের সমাধান এই বিচারালয়ের কাছে চাওয়া হয়। সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ মোট ১৫ জন বিচারককে নির্বাচিত

করে। হল্যাণ্ডের হেগ্ শহরে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দপ্তর।

॥ সেক্রেটারিয়েট ॥

আমাদের যেমন রাইটার্স বিল্ডিং, জাতিসংঘের তেমনি কর্মদপ্তর বা সেক্রেটারিয়েট। প্রধান সচিব হলেন সেক্রেটারি-জেনারেল; তাঁকে সুপারিশ করে নিরাপত্তা পরিষদ ও নিয়োগ করে সাধারণ পরিষদ। যাতে বিভিন্ন দপ্তর ঠিকমতো পরিচালিত হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমতো কর্মী সংগ্রহের ভার তাঁর ওপর।

জাতিসংঘের কাজ জাতি ও রাষ্ট্র নিয়ে। জাতি আসলে মানুষের সমষ্টি। তাই মানুষের নানা প্রয়োজন মেটাতে আছে নানা সংগঠন। এরা অহরহই খবরের কাগজের পাতা জুড়ে থাকে।

॥ আই. এল. ও. ॥

সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে আছে আন্তর্জাতিক শ্রম-দপ্তর I.L.O.। পুরো নাম International Labour Organisation। তোমাদের অনেকেরই ক্লাব বা স্কুলের যেমন একটি মটো (motto) আছে তেমনি এই শ্রমদপ্তরেরও একটা মটো আছে। সেটা শুনতে খুব ভালো : "যদি তুমি শান্তি চাও ন্যায়ের জন্যে কাজ করো।" সারা দুনিয়ার শ্রমিকের শ্রমের অবস্থা, জীবনের উন্নতি, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার অবনতি বন্ধ করা এই শ্রমদপ্তরের উদ্দেশ্য। তিন ধরনের প্রতিনিধি নিয়ে শ্রমদপ্তর গঠিত। এতে আছে সরকার, মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধিরা।

॥ খাদ্য ও কৃষি সংগঠন ॥

পৃথিবীতে যাতে খাদ্য, কৃষি, বনজঙ্গল ও মাছ যথেষ্ট হয় এবং গ্রাম-

বাসীদের জীবনের উন্নতি হয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে হয়েছে খাদ্য ও কৃষি সংগঠন F.A.O.। পুরো নাম : Food & Agricultural Organisation। রোম শহরে এর প্রধান কার্যালয়।

॥ U.N.E.S.C.O. ॥

জাতিতে জাতিতে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিনিময় ও প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ। পুরো নাম United Nations Educational Science and Cultural Organisation। এর কার্যালয় প্যারিসে।

॥ I.C.A.O. ॥

পৃথিবীর মাটিতে বা জলে যেমন যানবাহন চলাচলের নিয়ম আছে, আকাশপথেও তাই। এক দেশের এরোপ্লেন উড়ে যায় অনেক দেশের ওপর দিয়ে। তাই প্রয়োজন হয় আকাশপথে যাবার রীতিনীতি, আকাশপথে যাত্রীর নামাওঠার নিয়ম ঠিক করা। I. C. A. O. বা বেসামরিক আকাশযান সংগঠনের উদ্দেশ্য তাই। পুরো নাম International Civil Aviation Organisation।

॥ বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ॥

জাতিসংঘের সকল সভ্যের ব্যাঙ্ক হলো বিশ্ব-ব্যাঙ্ক। এতে সকলের অংশ আছে। সব রাষ্ট্র প্রয়োজনমতো টাকা ধার চাইতে পারে।

॥ বিশ্ব-তহবিল ॥

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে জাতিসংঘের প্রত্যেক সভ্যের অংশীদার

হবার অধিকার আছে। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক দেয় টাকা ধার আর বিশ্ব-তহবিল টাকা বিক্রি করে। মনে করো, বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ফরাসীদেশকে কয়েক কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে। ডলার মার্কিন দেশের টাকা। কিন্তু ফ্রান্সের দরকার ঐ টাকা ফরাসী দেশের টাকায় অর্থাৎ ফ্রাঙ্ক-এ পাওয়া। বিশ্ব-তহবিল I. M. F. সে ব্যবস্থা করবে।

॥ বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা ॥

শুধু রোগ বা দুর্বলতা থেকে মানুষকে মুক্ত করা নয়; শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে পূর্ণজীবনের সুযোগ দেওয়াই বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংগঠনের উদ্দেশ্য। জেনেভাতে এই সংগঠনের দপ্তর। এর উদ্যোগেই ভারতে শিশুদের যক্ষ্মারোগ থেকে বাঁচাবার জন্যে বি. সি. জি. টীকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিলো।

॥ বিশ্ব-ডাক বিভাগ ॥

ইংরেজী আদ্যক্ষরে U.P.U. নামে পরিচিত। পুরো নাম Universal Postal Union। আজ থেকে আশি বছর আগে সুইজারল্যাণ্ডে এর জন্ম হয়, কিন্তু জাতিসংঘ সৃষ্টির পর থেকে এ-বিভাগ তার অন্তর্গত হয়েছে। পৃথিবীর একদেশ থেকে অন্য দেশে ডাকমাশুলের হার ও ডাক পাঠানোর সহজ ব্যবস্থা করা এই বিভাগের কাজ।

॥ বিশ্ব-উদ্বাস্তু সংগঠন ॥

আমাদের দেশবিভাগের ফলে যেমন উদ্বাস্তুর সৃষ্টি হয়েছে,

তেমনি যুদ্ধের ফলে আরও অনেক দেশের মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। উদ্বাস্তুদের বসবাসের জায়গা, পুনর্বাসন, রুজি-রোজগার প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করবার কথা বিশ্ব-উদ্বাস্তু সংগঠনের।

॥ জাতিসংঘের আদর্শ ও বাস্তব ॥

পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার কাজে জাতিসংঘ কতো দূর সফল হয়েছে? আসলে জাতিসংঘ এখনো সত্যিই পৃথিবীর সকল জাতির সংঘ হয়ে ওঠেনি।

৬০ কোটি মানুষের দেশ চীন। সেখানে আজ জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের লীলাভূমি ছিলো চীন। আজ চীন হয়েছে স্বাধীন, মুক্ত আর নতুন জীবনে উল্লসিত। সেই নতুন চীন জাতিসংঘে নেই। কেন? আমেরিকা বাধা দিচ্ছে। চীনের জনগণ বিতাড়িত করেছে চিয়াং কাই-সেককে। চিয়াং কাই-সেক আমেরিকার সাহায্যে চীনের জমি ফরমোসা দ্বীপে বসে রয়েছে। সেই চিয়াং কাই-সেক চীন এখনও জাতিসংঘের নানা বিভাগে বসে চীনের প্রতিনিধিত্ব করছে। বলতে গেলে আমেরিকা তাকে জিইয়ে রেখেছে জাতিসংঘে।

আরও অনেক দেশ আছে যারা জাতিসংঘে প্রবেশ করতে পারছে না আমেরিকার বাধার জন্যে।

জাতিসংঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবাদের সমাধান করতে পারেনি। কাশ্মীরের সমস্যা আজ ছ বছরের ওপর জাতিসংঘের হাতে। জাতিসংঘের নামে যারা এসেছে কাজের বদলে গোয়েন্দাগিরি

করে তারা অকাজ করছে বেশি।

ছোটো দেশ গুয়াতেমালা। সেখানকার নির্বাচিত সরকারকে বাইরে থেকে আক্রমণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা হটিয়ে দিলো। জাতিসংঘ কিছুই করলো না।

এমনকি খোদ জাতিসংঘের নামেই আক্রমণ ও যুদ্ধ চালানো হলো কোরিয়াতে। জাতিসংঘে তাই কোনো দেশ আস্থা রাখতে পারছে না। ফলে কোরিয়া ও ইন্দোচীনের সমস্যার সমাধান করার জন্যে জাতিসংঘের পরিধির বাইরে জেনেভায় বসলো ২৯টি দেশের সম্মেলন।

জাতিসংঘ আজ আমেরিকার কুক্ষিগত হতে চলেছে। জাতি-সংঘের সনদের মূলে প্রথম আঘাত হেনেছে আমেরিকাই।

মার্শাল প্লান

গত মহাযুদ্ধে আমেরিকা প্রচুর লাভ করেছে। সেখানকার ব্যবসায়ীরা যুদ্ধকে বড়ো ব্যবসা বলেই জানে। তাই যুদ্ধ শেষ হতেই তারা আরেক মহাযুদ্ধের আয়োজনে শুরু করেছে। সেই উৎসাহে যুদ্ধবাজ বড়ো বড়ো পুঁজিপতিরা কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছে। যুদ্ধ একা করা যায় না। চাই অন্য দেশের সাহায্য। এদিকে আমেরিকা বাদে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তখন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। জার্মান সৈন্য ইউরোপকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। জাপান করেছে এশিয়ায় অমানুষিক অত্যাচার। দেশে দেশে খাদ্য, বাসস্থান ও চাকরির অভাব। কলকারখানা হয় অচল নয় ধ্বংস হয়েছে। চারিদিকে অরাজকতা ও দৈন্য। টাকার বাণ্ডিল

হাতে নিয়ে আমেরিকা এলো সাহায্য করতে। তখনকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ মার্শাল বললো, ইউরোপে ডলারের অভাব; আমরা সে-অভাব মেটাবো যদি ইউরোপের দেশগুলি আমাদের সমর্থন করে। ১৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মার্শালের প্রস্তাব গ্রহণ করলো। এই সব রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কর্মসূচী স্থির করলো (European Recovery Programme)—এক কথায় মার্শাল প্লান নামে যার পরিচয়। বর্তমানে নামকরণ হয়েছে 'ইউরোপীয় অর্থনীতি সহযোগিতা সংগঠন' (O.E.E.C.)। তবু ইউরোপের সকল দেশ এই প্লান মানলো না। এমনকি যে যে-দেশ মেনেছে সেখানকার জনসাধারণ তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। কেননা একদিকে ঋণের বোঝা বাড়লো; অপরদিকে ডলারের সাহায্য দিয়ে আমেরিকা জোট গঠনের বনেদ সৃষ্টি করলো।

ন্যাটো

এইভাবে উত্তর অতলান্তিক চুক্তির জন্ম হলো। একেই আমরা কাগজের পাতায় দেখি 'ন্যাটো' (N.A.T.O.) নামে। পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে সামরিক চুক্তি তার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো চুক্তিবদ্ধ দেশের সমরোপকরণের বোঝা বওয়া। ১৪টি রাষ্ট্রের এই চুক্তিতে নানান দেশ আছে; অতলান্তিক থেকে অনেক দূরের দেশ তুর্কী আছে, কিন্তু নেই ইউরোপের গণতান্ত্রিক কোনো দেশ, যেমন সোবিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি।

ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

যুদ্ধজোট পাকানোর চরম দৃষ্টান্ত হলো ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা (European Defence Community)। সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে একটিমাত্র সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তরিত করার তীব্র চেষ্টা চলছে। সেই সৈন্যবাহিনীতে জার্মানির সৈন্যকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চায় মার্কিন যুদ্ধবাজরা। স্বভাবতই জার্মান সৈন্যের উৎপীড়ন সহ্য করে ইউরোপের সাধারণ লোক কিছুতেই রাজী হবে না জার্মান সৈন্যবাহিনীর পুনরভ্যুত্থান। প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়ে এইসব পশ্চিমী রাষ্ট্র ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়তে সক্ষম হচ্ছে না।

ট্রুম্যান ডকট্রিন

ইউরোপে যেমন মার্শাল প্লান, এশিয়ায় ট্রুম্যান ডকট্রিনও তেমনি মার্কিন সাহায্য। ট্রুম্যান ছিলো আমেরিকার রাষ্ট্রপতি। তারই আমলে শুরু হলো ভারতে ও এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে ডলারের সাহায্য।

এন্‌জাস

মার্কিন প্রচেষ্টায় ইউরোপের 'ন্যাটোর' মতো অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও আমেরিকা এক সামরিক জোট গঠন করেছে। একেই আমরা 'এন্‌জাস' বলি। এই রকম চুক্তি হলো মার্কিন ও পাকিস্তান সামরিক চুক্তি—যার কথা তোমরা আগেই পড়েছো।

এই সকল সামরিক জোট বা চুক্তির উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধের আয়োজন ও যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করা।

SEATO ও MEDO

ইন্দোচীনে শান্তি-চুক্তির পরও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামরিক জোট গঠনের চেষ্টা চলেছে। SEATO-র কথা তোমরা খবরের কাগজে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো। তেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ নিয়ে জোট তৈরি করার নাম হয়েছে MEDO। এইভাবে জাতি-সংঘের বাইরে একটার পর একটা সামরিক জোট বা চুক্তি মার্কিন দেশ করে চলেছে।

আরব লীগ

আরব দেশগুলি পরস্পরের স্বার্থরক্ষার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আরব লীগে।

কলম্বো প্লান

এশিয়ার অনুন্নত দেশে সাহায্য করার মতো আমেরিকার মতো ব্রিটেন এক প্লান করেছে ১৯৫১ সালের জুলাই থেকে। তার নাম কলম্বো প্লান। এই কলম্বো প্লানে পাওয়া যাবে ষ্টার্লিং। ব্রিটেন, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া এর মোটা অংশীদার। কলম্বো প্ল্যানে ভারত আছে ও সাহায্য পেয়ে থাকে।

চৌ-নেহেরু চুক্তি

যুদ্ধজোট আর অর্থনৈতিক চুক্তির ঠমকে চমক লাগিয়েছে

সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্যে ভারত-চীনের তিব্বত সম্পর্কে চুক্তি আর ভারত ও চীনের প্রধান মন্ত্রীদের যুক্ত ঘোষণা। যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার জন্যে এই ঘোষণায় যে পাঁচটি নীতি প্রচারিত হয়েছে তা ভবিষ্যতের নিরাপত্তার পথ দেখিয়েছে। এই পাঁচটি নীতি কী কী? পরস্পর পরস্পরের দেশের অখণ্ডতা স্বীকার করবে অর্থাৎ কেউ কারুর দেশ আক্রমণ করবে না। এক দেশ অন্য দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। একে অন্যকে সমান মর্যাদা ও সুবিধা দেবে। পরস্পর-বিরোধী সমাজব্যবস্থা হলেও ভারত-চীন শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করবে। এইভাবে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই আর ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ভারত ও চীনের ৯৬ কোটি মানুষকে তথা এশিয়াবাসীদের শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংহত করলেন। দুনিয়ার লোক সাগ্রহে চেয়ে আছে—এই পাঁচটি নীতির সার্থক প্রয়োগ হোক বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ও সমষ্টিগতভাবে।

বিশ্ব-শ্রমিক ফেডারেশন

জাতিসংঘ থেকে আলাদা পারস্পরিক চুক্তির মধ্যে আছে বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন দেশের সরকার। এই সব দেশের জনগণের কী সংগঠন আছে তা আমাদের জানা দরকার। মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর বা সমাজের বিভিন্ন অংশের নানারূপ সংগঠন আছে। এইরূপ কয়েকটি প্রধান সংগঠন, যাদের পরিধি বিশ্বব্যাপী, তাদের কথা আমাদের জানতে হবে।

"দুনিয়ার মজুর এক হও" এই আওয়াজ তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। আমাদের দেশে শ্রমিকরা যখন শোভাযাত্রা করে যায় তারা সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে "দুনিয়া কী মজদুর এক হো" আশ্চর্য কাহিনী এই দুনিয়ার মজুরদের এক হওয়ার ও একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলার। বিশ্ব-শ্রমিক ফেডারেশন বর্তমান পৃথিবীর কোটি কোটি মজুরের একমাত্র সংগঠন। এই সংগঠনে আছে সেই সব শ্রমিক যারা বিপ্লব করেছে আর প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রবাদ। যে শ্রমিকেরা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর পেটভরে খাওয়ার মজুরি পায় না তারাও আছে। এখানে সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রমিক রয়েছে। রয়েছে ফ্রান্স ও ইতালির মতো শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী। আছে ভারত, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকেরা। বিশ্ব-শ্রমিক ফেডারেশন গঠিত হয় ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৯-এ ব্রিটেন ও আমেরিকার শ্রমিক সংগঠনগুলি ফেডারেশন ছেড়ে চলে যায়। আমাদের দেশের শ্রমিকদের তিনটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য। ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয় অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে।

বিশ্ব-নারী সংঘ

ভিয়েনায় বিশ্বনারী সংঘের দপ্তর। ১৯৪৫-এ বিভিন্ন দেশের নারীদের বিভিন্ন সংগঠন নিয়ে এর প্রতিষ্ঠা হয়। মেয়েদের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার, জীবিকা, শিক্ষা, শিশুরক্ষা

প্রভৃতির জন্য বিশ্বনারী সংঘ সংগ্রাম করে চলেছে।

বিশ্ব-যুব ফেডারেশন

শ্রমিক ও নারীদের মতো যুবকদের বিশ্বব্যাপী সংগঠন বিশ্ব-যুব ফেডারেশন। জীবিকা, শিক্ষা, খেলা, আমোদপ্রমোদ, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার প্রভৃতি প্রশ্নে বিশ্ব-যুব সংঘ অগ্রণী ও সহায়ক। আমাদের দেশে যেমন মেলা হয়, পৃথিবীর নানা দেশের যুবক ও ছাত্রদের বিশ্বমেলার আজ দুনিয়াজোড়া খ্যাতি। ১৯৪৭ থেকে প্রতি ২ বছর অন্তর বিশ্বমেলায় পৃথিবীর যতো দেশের হাজার হাজার যুবকদের উৎসবে সকল দেশের যুবশক্তি ক্রমশ বন্ধুত্ব ও মৈত্রীবন্ধনে দৃঢ় হচ্ছে। প্রতি উৎসবেই আমাদের দেশ থেকে গেছে অনেক প্রতিনিধি। ১৯৫৩-এ বুখারেষ্ট যুব উৎসবে ভারতের যুবদের সকল অংশের প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলো।

আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ-এ আছে সকল দেশের ছাত্রদের সংগঠন—আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন। ইংরাজীতে International Union of Students বা I. U. S.। ছাত্রদের এর মতো বড়ো এক বিশ্ব-সংগঠন আর নেই। আই-ইউ-এস দরিদ্র দেশের ছাত্রদের লেখাপড়া, স্বাস্থ্য ও জীবনের উন্নতির জন্যে নানাভাবে সাহায্য করে। দেশ-বিদেশের ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্যে এই সংগঠন অসাধারণ কাজ করে চলেছে।

বিশ্ব-শান্তি সংসদ

আজকের পৃথিবীতে বিশ্বশান্তি সংসদ এক সেরা সংগঠন। পাঁচ বছর আগে পোল্যাণ্ডের শহর ভ্রাস্‌লাউতে দুনিয়ার সব নাম-করা সাহিত্যিক, লেখক ও বৈজ্ঞানিকদের এক সভা হয়। তাঁরা ডাক দিলেন দুনিয়ার লোককে। বললেন, আর যুদ্ধ নয়। মানুষকে ও মানুষের সৃষ্টিকে ধ্বংস করা চলবে না। পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখার সময় হয়েছে আর মানুষ শান্তি বজায় রাখবেই। কেননা মানুষের জন্যেই শান্তি, শান্তির জন্যেই মানুষ। তাঁদের ডাকে সাড়া দিলেন বিশ্ব-নারী সংঘ ও বিশ্ব-শ্রমিক ফেডারেশন। সাড়া দিলেন বহু মনীষী ও আরও অনেকে। সভা বসলো প্যারিসে। জন্মগ্রহণ করলো পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এক সংগঠন যার নাম বিশ্ব-শ্রান্তি সংসদ। সৃষ্টি হলো মহান আদর্শ নিয়ে এক মহান সংগঠন। এই সংসদে নেই এমন দেশ আর লোক নেই। নেই এমন লোক যে যুদ্ধ চায়। এতে আছেন বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা—সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক, চিন্তাবীর ও সামাজিক কর্মী, শিল্পী ও রাজনীতিক। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞা-নিক অধ্যাপক জোলিও কুরি এই সংসদের সভাপতি। পুরো-ভাগে আছেন বিখ্যাত সোবিয়েত ঔপন্যাসিক এহেরনবুর্গ, ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বার্নাল, চীনের চিন্তাবিদ কুয়ো-মোজো, ভার-তের ডাঃ সইফুদ্দিন কিচলু, মেজর জেনারেল সাহেব সিং শোখে প্রভৃতি।

যদি পৃথিবীর লোক শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নেয় তাহলে শান্তি

বজায় থাকবে। শান্তি আন্দোলনের এই ডাক তুনিয়ার দেশে-দেশে সকল লোকের কাছে পৌঁছেছে। ভয় পেলো যারা যুদ্ধ চায়। যুদ্ধ তাদের পেশা। যুদ্ধে প্রচুর লাভ। যুদ্ধের কাছে মানুষ কিছুই নয়। তাই বিজ্ঞানকে তারা লাগালো যুদ্ধের আয়োজনে : তৈরি করো অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা। বানাও জীবাণু বোমা আর পেট্রল জেলি। দেশদখলের প্রয়োজনে ভেঙে নষ্ট করে দাও মাঠ ঘাট আর মানুষকে।

বিশ্ব-শান্তি সংসদ ডাক দিলো, অ্যাটম্ বোমা বন্ধ করো। ৫০ কোটি লোক সই করে তাদের মত জানালো। আবেদন এলো, পাঁচটা প্রধান শক্তির মধ্যে শান্তিচুক্তি হোক। ৬০ কোটি লোক সে আবেদনে সই করে জানালো সম্মতি।

মার্কিনের জিদ্ যে জাতিসংঘে চীনকে গ্রহণ করবো না। তবু কোরিয়া ও ইন্দোচীনের শান্তির জন্যে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডালেসকে জেনেভায় নয়াচীনের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে হলো। কোরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বীর কোরিয়াবাসীর কাছে ভীষণ বাধা পেলো। মার্কিন সভাপতি অ্যাটম বোমার হুমকি ছাড়তেই ৫০ কোটি লোক এর বিরুদ্ধে মত জানিয়েছে। ভারত থেকে ব্রিটেন কোটি কোটি মানুষ গর্জে উঠেছে অ্যাটম বোমার বিরুদ্ধে। মার্কিনরা অ্যাটম বোমার ব্যবহার করতে পারলো না। বিশ্বশান্তি সংসদ পৃথিবীর মানুষকে শান্তির পথে নিয়ে চলেছে। কোটি কোটি লোকের সমর্থনে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের আজ জয়জয়কার। যুদ্ধবাজরা বার বার পিছু হটছে, যদিও তারা আরো বেশি খ্যাপার মতো হয়ে যুদ্ধ লাগাতে বা যুদ্ধের আবহাওয়া বজায় রাখতে কসুর

করছে না। শান্তির ভয় তাদের এতো যে শান্তি সংসদের নাম তারা সহ্য করতে পারে না। শান্তিসম্মেলনের খবর চেপে রাখার অনেক কৌশল তারা অবলম্বন করে। খবরের কাগজে খবর দিতে চায় না। কিন্তু শান্তি কারুর সম্পত্তি নয়। পৃথিবীর লোকের ইচ্ছা, আগ্রহ ও সংগ্রামেই বিশ্বশান্তি আন্দোলন। সূর্যের আলোর মতো মিথ্যার অন্ধকার ভেদ করে তার রূপ প্রকাশ পায়। বিশ্ব-শান্তি সংসদ বলছে, দেশে দেশে বন্ধুত্ব গড়ে তোলো। স্থাপন করো বাণিজ্য ও ব্যবসার সম্পর্ক। সংস্কৃতি ও জ্ঞানের বিনিময়ে বিভিন্ন দেশের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হোক। যুদ্ধের আবহাওয়া নয়—তার অবসান হোক। এমন বিষয় নেই যা পরস্পর আলোচনার মধ্য দিয়ে মীমাংসা করা যায় না। চুক্তি হোক—ইউরোপ ও এশিয়ার দেশে দেশের মিলিত যৌথ চুক্তি।

চীনের রাজধানী পিকিংএ হয়েছে এশিয়াবাসীর শান্তি সমাবেশ। ভিয়েনায় হয়েছে বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের অভূতপূর্ব সমাবেশ। অনেক দেশের লোক, অনেক ধরনের লোক, অনেক পেশার লোক এমনকি অনেক দেশের সরকার বিশ্ব-শান্তি আন্দোলনে এগিয়ে আসছে।

নোবেল পুরস্কার

কোনো দেশের বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক বা সমাজ-সেবকের কোনো বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে যোগ্য সমাদর দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক পুরস্কারে। আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়া যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই এক শ্রেষ্ঠ সম্মান। তোমরা নোবেল

পুরস্কারের নাম নিশ্চয়ই জানো। আলফ্রেড নোবেল ছিলেন সুইডেনের এক বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার। ডিনামাইট ও রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে পাহাড় ওড়ানোর ব্যবসায় নোবেল অজস্র টাকা রোজগার করেন। জারশাসিত রাশিয়ায় বাকুর তেলের খনিতে টাকা খাটিয়ে আরও অনেক টাকা নোবেল জমিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর প্রভূত অর্থের এক মোটা অংশ নোবেল ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি রেখে যান। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসা বা শরীরবিজ্ঞানের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারক এবং সাহিত্যজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক-রচয়িতা ও পৃথিবীর শান্তির জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি যিনি উদ্যোগী এই পাঁচজন মনীষীকে বছরে একবার এককালীন পুরস্কার প্রদান করা নোবেল ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশ্য। নোবেল পুরস্কার দেবার জন্যে বিচারক আছেন। সকল বিষয়ে সকল দেশের জ্ঞানী-গুণীদের যোগ্য বিচার বা সমাদর নোবেল পুরস্কারের বিচারকরা করেন না। বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণায় যথেষ্ট তার-তম্য দেখা বায়। সাহিত্য ও শান্তির পুরস্কারের বিষয়ে এ-কথা বিশেষভাবে খাটে। এর কারণ, বিচারকদের ধ্যানধারণা অনেকটা নির্দিষ্ট হয় মার্কিন শাসকদের কথায়। তাঁদের কাছে শান্তি অর্থে বিশ্বজয়। মার্কিন নীতির বিরোধিতা করেন যিনি তাঁর জন্যে নোবেল পুরস্কার বন্ধ। একসময়ে আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ ও সি-ভি রমন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আজ চার্লি চ্যাপলিনকে আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাঁর কীর্তির জন্যে দেওয়া হয় না নোবেল পুরস্কার।

আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার

বিশ্ব-শান্তি সংসদ সম্মানিত করেছেন চ্যাপলিনকে আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার দিয়ে। সারা বিশ্বের শান্তির জন্যে যাঁর দান সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁকে দেওয়া হয় এই পুরস্কার। নোবেল পুরস্কারের মতো শুধুমাত্র নরওয়ের পার্লামেণ্ট বিচার করে না শান্তির প্রধান সৈনিককে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাবীরদের বিবেচনায় আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার কাকে দেওয়া হবে স্থির করা হয়।

সোবিয়েত ইউনিয়নে দেওয়া হয় স্তালিন পুরস্কার। সোবিয়েতের যাঁরা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, লেখক ও কর্মী তাঁদের সম্মানিত করা হয় স্তালিন পুরস্কারে। আর স্তালিন শান্তি পুরস্কারে সমাদৃত করা হয় তুনিয়ার শান্তির শ্রেষ্ঠ নেতাদের। আমাদের দেশের ডাঃ সইফুদ্দিন কিচলু ও ডাক্তার সাহেব সিং শোখে স্তালিন শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন।

ভারতের গণ-সংগঠন

তোমাদের আছে ক্লাব ও নানা ধরনের সংগঠন। ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজের তেমনি বিভিন্ন সংগঠন আছে। আমাদের কাগজের পাতায় এই সব সংগঠনের কথা অহরহই দেখা যায়। কয়েকটা প্রধান প্রধান সংগঠন বা সমিতির পরিচয় আমাদের জানা দরকার।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী এখনও এক হতে পারেনি। নানা রাজনৈতিক দলের প্রভাব শ্রমিকদের বিভক্ত করে রেখেছে।

এখনও অসংখ্য শ্রমিক তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে ও জীবনের মান উন্নয়নের জন্যে এগিয়ে আসেনি, সংঘবদ্ধ হয়নি। ফলে সকল প্রকার শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন ও একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি। যে সকল শ্রমিকেরা সংগঠিত হয়েছে, তাদের তিনটি কেন্দ্রীয় সংগঠন আছে—নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস A. I. T. U. C. ; হিন্দ মজতুর সভা H. M. S. ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস I.N.T.U.C.

নারীদের আছে তুটি সারা-ভারত সংগঠন : জাতীয় মহিলা কংগ্রেস ও অখিল ভারত মহিলা মণ্ডল-—A.I.W.C.

ছাত্রদের আছে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন—A.I.S.F. ও সারা ভারত ছাত্র কংগ্রেস—A.I.S.C.

কৃষকদের সারা ভারতের সংগঠন হলো নিখিল-ভারত কিসান সভা।

বিশ্বশান্তি সংসদের অন্তর্ভুক্ত সারা ভারত শান্তি সংসদ। সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সমাজের সকল শ্রেণী ও অংশের প্রতিনিধি নিয়ে ভারতের শান্তি সংসদ গঠিত হয়েছে। ভারতবাসীর শান্তির আকাঙ্ক্ষা ও ভাষাকে রূপ দেয় শান্তি সংসদ আর সংগঠিত করে ভারতের জনগণকে বিশ্বশান্তির আন্দোলনে।

খবরের কাগজের মালিকদের প্রতিষ্ঠান হলো নিখিলভারত সংবাদপত্র সম্পাদকদের সমিতি A. I. N. E. C.—All India Newspaper Editors' Conference.

খবরের কাগজের সাংবাদিকদের সংগঠন—'নিখিল ভারত

বেতনভুক বার্তাজীবী সংঘ'।

সারা ভারতের রেল-কর্মচারীদের সংগঠন হলো All-India Railwaymen's Federation ও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংঘ হলো All-India Bank Employees' Association ও All-India Bank Employees' Federation। ইন্সিওরেন্স, ডক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন আছে।

ভারতে বিদেশী ও দেশী ব্যবসায়ীদের নিজস্ব সংঘ আছে। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান হলো, চেম্বার অফ্ কমার্স। এরকম চেম্বার্স আছে পশ্চিম বাঙলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর প্রদেশে। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আরও সংঘ আছে—যেমন প্ল্যান্টার্স ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন। আমাদের দেশের চা ও কফি বাগানের ওরাই তো মালিক। এই সব বিদেশী ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংঘের বার্ষিক সভা হয়। তার নাম অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ্ কমার্স। এ-সব সভার সভ্য বলতে আমাদের দেশের কলকারখানা, চা ও কফি-বাগান, জাহাজ আমদানি, কয়লা-খনি ও বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কের সব জাঁদরেল মালিক। তাদের বার্ষিক সভা তো তোমার আমার ক্লাব বা সংগঠনের সভার মতো নয়। দেশের শিল্প ও অর্থনীতি এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। কোটি কোটি টাকা খাটছে তাদের ব্যাবসায়। এদেশে পাওয়া যায় সস্তায় কাঁচা মাল আর মজুর। এমনটি তো আর নিজের দেশে হবে না! তাই লাভের সীমা নেই। খোদ্ ইংল্যাণ্ডে বসে যা লাভ এখানে তার চেয়ে ঢের বেশি হয়। প্রতি বছরে সে টাকা দেশে চালান দেওয়া যায়।

মোটা টাকা কমিশন, স্থদ ও শেয়ারে লাভ তো আছেই। ভারতের বাজারে যতো পারো লাভ করো। তাতে এ-দেশের শিল্প বাঁচলো বা মরলো দেখার দরকার নেই। ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের চাবিকাঠি তাই ওদের হাতে। এর ওপর আছে নিজেদের খবরের কাগজ। নিজেদের বার্ষিক সভায় বসেই আমাদের বিদেশী মালিকেরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতি ঠিক করে। সেজন্যেই বিদেশী—বিশেষ করে ইংরেজ—মালিক-গোষ্ঠীর সংঘ ও সম্মেলন কাগজের পাতায় এতোখানি জায়গা জুড়ে বসে।

দেশী ব্যবসায়ীদের আছে নানাবিধ সংঘ। অবশ্যই সব প্রদেশে তাদের চেম্বার অফ্ কমার্স আছে। সবার ওপরে হলো ফেডারেশন অফ্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ্ কমার্স। ভারতীয় বণিক সংঘেরও কিছু কম প্রতিপত্তি নয়। সরকার এদেরও খাতির করে। বার্ষিক সভাসমিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বক্তৃতা দিয়ে যেতে হয়। অনেক কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্‌স্ প্রভৃতির মালিক হয়েও ভারতীয় ব্যবসায়ী বা পুঁজিপতিদের দুঃখ কম নয়। কেননা এখনও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল ঘাঁটি ইংরেজদের হাতে আছে। সভায় সম্মেলনে সে কথা মাঝে মাঝে টের পাওয়া যায়।

ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীরা নানা সংঘের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে। আর আছে নিখিল ভারত তাঁত-শিল্পীদের প্রতিষ্ঠান। এককালে তাদের বাজার ও স্থনাম ছিলো। আজ কিন্তু তাদের

ভীষণ সংকট। দেশের লোকের হাতে পয়সা নেই যে তাদের কাপড় কেনে। সস্তা ও দরকারমতো সুতো পাওয়া যায় না। ওদিকে কলে তৈরি কাপড়ের প্রতিযোগিতা রয়েছে। তাদের প্রতিষ্ঠান তাই জোর করে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পার্টি

সাধারণ নির্বাচনের কথা মনে আছে? "জোড়া বলদে ভোট দিন", "ভোট দেবেন কিসে, কাস্তে-ধানের শীষে" প্রভৃতি আওয়াজে হাওয়া গরম ছিলো। তোমাদের বাবা, কাকা, দাদা, মা—সব বড়োরা কাকে ভোট দেবেন ভেবে মহা ফাঁপরে পড়েছিলেন। সে সময় অনেক প্রার্থী এসেছিলেন। এঁদের প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী। আমাদের দেশে অনেক রাজনৈতিক দল বা পার্টি আছে। বাঙলাদেশে তো কথাই নেই। ছোটো বড়ো কতো যে পার্টি—গুনে শেষ করা যেন কঠিন। আমরা এই সবগুলি পার্টিরই পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো না। বড়ো বড়ো পার্টি, যাদের সারা ভারতে পরিচয় আছে, তাদের কথাই বিশেষ করে জানা দরকার।

॥ জাতীয় কংগ্রেস ॥

জাতীয় কংগ্রেস—ভারতের সবচেয়ে বড়ো পার্টি। ভারতের কেন্দ্রে ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন বাদে ২৭টি রাজ্যে কংগ্রেসের হাতে শাসনভার আছে। ১৯৪৮-এর বাৎসরিক অধিবেশনে নূতন করে কংগ্রেসের লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের জনগণের

সুখ ও উন্নতি, সকল ব্যক্তির সমান সুযোগ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ ও নীতিসংগত উপায়ে সমস্বার্থ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বন্ধুত্ব ও বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া কংগ্রেসের কর্মসূচীর মূল বক্তব্য।

॥ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ॥

জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিষ্ট পার্টি মনে করে যে, বর্তমান গণতন্ত্র-বিরোধী, জনগণ-বিরোধী সরকারের পরিবর্তে জনগণের গণতান্ত্রিক এক নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার কর্তব্য পালনের সময় হয়েছে! দেশের সকল গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী শক্তির ঐক্যের মধ্য দিয়ে এক নতুন সরকার গড়ে উঠবে। এই সরকার জনগণের অধিকারকে কার্যকরীভাবে সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হবে; কৃষককে বিনামূল্যে জমি দেবে; আমাদের দেশীয় শিল্পকে বিদেশী জিনিসের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করবে; শিল্পের উন্নতি সুনিশ্চিত করবে; শ্রমিকদের উন্নত ধরনের জীবনের ব্যবস্থা করবে; দেশকে বেকারির হাত থেকে মুক্ত করবে ও এই ভাবে দেশকে প্রগতি, সাংস্কৃতিক উন্নতি ও স্বাধীনতার প্রশস্ত পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

॥ প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টি ॥

সোশ্যালিষ্ট পার্টি আর কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি এই দুয়ের মিলনে গড়ে উঠেছে প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টি।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের মধ্যেকার কিছু বামপন্থী সভ্য কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে এবং নিজেদের নাম থেকে কংগ্রেস শব্দটি বাদ দিয়ে সোশ্যালিষ্ট পার্টি বলে পরিচিত হয়।

এই পার্টির মতে "এমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হওয়া উচিত যেখানে ব্যক্তি অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিক স্বাধীন এবং আইনগত পন্থা অনুসরণ না করে রাষ্ট্রের পক্ষে কোনো ব্যক্তিকেই তার ন্যায্য অধিকার ও সুযোগসুবিধে থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা, কাজের মজুরি ও অন্যান্য শর্ত ঠিক করা, দাম ধার্য করা, উৎপাদিত ধনের বণ্টন করা ইত্যাদি কাজের জন্যে ক্ষমতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের চালকদের হাতে থাকবে না। এই সকল কাজের জন্যে ক্ষমতা রাষ্ট্রের চালক, ট্রেড ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ এবং মেহনতী মানুষের অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে ভাগাভাগি করা থাকবে।"

১৯৫১ সালে ভারতের নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর এই পার্টির পক্ষে অন্য কোনো পার্টির সঙ্গে যুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না। সাধারণ নির্বাচনের কিছু আগে আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একটি পার্টি করেন এবং তার নাম দেন কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি। ১৯৫২ সালে এই দুই পার্টিই অনুভব করে যে যদি জনসাধারণের মনে কোনো রেখাপাত করতে হয় তবে দুইটি দলেরই সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ১৯৫২ সালে এই সংযোগ হয়। ১৯৫১ সালের নির্বাচনে সোশ্যালিষ্ট পার্টি বামপন্থী দলগুলির সহিত সহযোগিতায় নির্বাচনে

প্রতিযোগিতা না করায় নিজেরা তো শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ই, উপরন্তু বামপন্থী ভোট বিভক্ত করে দিয়ে কংগ্রেস পার্টিকে জয়লাভ করতে সাহায্য করে।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পার্টিগুলির মধ্যে প্রজা-সোশ্যালিষ্ট পার্টির বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, এই পার্টি ঘোরতরভাবে সোবিয়েত ও নতুন চীনের বিরোধী। দ্বিতীয়ত, এই পার্টিই একমাত্র পার্টি যা পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির সমালোচনা থেকে বিরত থেকেছে।

॥ তপশীলি জাতীয় ফেডারেশন ॥

ডাঃ আম্বেদকর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই পার্টির উদ্দেশ্য তপশীলি জনসাধারণের উন্নতি সাধন। প্রধানত সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ ও হিন্দু সমাজের জাতি-বৈষম্য নীতির বিরোধিতা করা এই পার্টির প্রধান কাজ। ডাঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে এই দল ভারতীয় জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম থেকে দূরে থাকে। আজও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে একযোগে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গঠনে এই পার্টি মোটেই উৎসাহী নয়—যদিও সংঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে তপশীলি জনসংখ্যার প্রভূত লাভ হবার কথা, কারণ এই সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ কারখানার শ্রমিক। সম্প্রতি এই পার্টির মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই পার্টির নীতি ও কর্মপন্থায় বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে বিশেষজ্ঞরা

মনে করেন।

॥ হিন্দুমহাসভা, জনসংঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ॥

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও ঘোর প্রতিক্রিয়াশীলতা এই তিনটি পার্টির নীতি। সাম্প্রদায়িকতা, মুসলমান-বিরোধিতা, হিন্দুধর্ম রক্ষা এই নীতির ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনতার সংগ্রামের বিরোধিতা করা এবং কংগ্রেস সরকারের যা-কিছু কাজ কিছু পরিমাণে প্রগতিশীল তার বিরোধিতা করা এই পার্টিগুলির বিশেষ বিশেষত্ব। সাধারণত হিন্দু জমিদার শ্রেণী এই পার্টিগুলির পৃষ্ঠপোষক। বর্তমানে সরকার-প্রস্তাবিত হিন্দু কোড বিলের বিরোধিতা এই পার্টিগুলিকে কর্মচঞ্চল করে তুলেছে।

॥ দ্রাবিড় কাজগাকম পার্টি ॥

মাদ্রাজ রাজ্যের তামিলনাদ অঞ্চলে এই পার্টির কিছু প্রসার আছে। এই পার্টির নীতির মূলকথা : আর্য সভ্যতার আক্রমণ থেকে দ্রাবিড় সভ্যতাকে রক্ষা করা। এই নীতির ফলে বহু স্থলে এই পার্টি জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অথবা পুঁজিপতি-বিরোধী সংগ্রামের বিরোধিতা করে। বর্তমানে এই পার্টির বাম-পন্থী মতাবলম্বীরা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে আর একটি পার্টি গঠন করেছে। হিন্দী ভাষার প্রচলনের বিরোধিতা করা এই পার্টির বর্তমানে প্রধান কাজ বলে মনে হয়।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

ভারত সরকার কর্তৃক দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে রচিত পাঁচশালা পরিকল্পনা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ১৯৫১-৫৬। পাঁচ বৎসরে মোট খরচ হবে ২০৬৯ কোটি টাকা। কোন্ খাতে কতো ব্যয় করা হবে তার হিসেব :

	কোটি টাকা	মোটের শতকরা
কৃষি ও কমিউনিটি প্রোজেক্ট	৩৬১	১৭·৫
সেচব্যবস্থা	১৬৮	৮·১
বিভিন্ন কাজের উপযোগী জলসেচ ও শক্তি উৎপাদন	২৬৬	১২·৯
শক্তি উৎপাদন	১২৭	৬·১
যানবাহন ও তার বেতার ইত্যাদি	৪৯৭	২৪·০
শিল্প	১৭৩	৮·৪
জনসেবার কাজ	৩৪০	১৬·৪
উদ্বাস্তু সেবা	৮৫	৪·১
অন্যান্য	৫২	২·৮
মোট	২০৬৯	১০০

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতির কয়েকটি বিশেষ নমুনা হিসেবে ভারত সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন :

১। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫২-৫৩ সালে খাদ্যশস্য ৪·৪ মিলিয়ন টন বেড়েছে।

২। ৪৭০০০ হাজার গ্রামকে কেন্দ্র করে এবং ৩ কোটি ৭০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে কমিউনিটি প্রোজেক্ট ও জাতীয় সম্প্রসারণ

পরিকল্পনা (National Extension Scheme) চালু করার ফলে আমাদের দেশের গ্রামবাসীর মোট সংখ্যার হিসেবে প্রতি আট জনের মধ্যে একজন কৃষি-উন্নয়ন, গ্রাম-উন্নয়ন বিদ্যা শিক্ষা-লাভ করেছে।

৩। ছোটো ছোটো জলসেচন কাজের সাহায্যে ১৯৫২ সালের শেষ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা হয়েছে। ৫০ লক্ষ একর জমিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা হয়েছে।

৪। বিভিন্ন নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার ফলে ১৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা হয়েছে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। তারপর ভাকরা-নাংগাল পরিকল্পনার কাজ পরিকল্পনার এক বছর আগেই শেষ হওয়ায় যে জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা হয়েছে তার পরিমাণ অনেক বেড়েছে। এ ছাড়া ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত ৪২৫০০০ কিলোওয়াট নতুন বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হয়েছে।

৫। তুলোর সুতোর উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালে ছিলো ১১৭৯ মিলিয়ন পাউণ্ড, ১৯৫২-৫৩ সালে তা বেড়ে ১৪৫০ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে। কাপড়ের কলের উৎপাদনের যে-সীমা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট হয়েছিলো (৪৭০০ মিলিয়ন গজ) তা পূর্ণ হয়েছে পরিকল্পনার মেয়াদ ফুরোনোর আগেই।

৬। রুরকেলায় সরকার-পরিচালিত লোহা ও ইস্পাত কারখানা তৈরির জন্যে ক্রাপ ও ডেমাগ নামক জার্মান কোম্পা-নির সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। বার্নপুরের লোহা ও ইস্পাত কোম্পানিটি কারখানা বাড়ানোর খরচ হিসেবে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার ঋণ পেয়েছে।

৭। সিমেণ্ট উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালে ছিলো ২.৬৯ মিলিয়ন টন : ১৯৫২-৫৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩½ মিলিয়ন টনে।

৮। সিনড্রি সার কারখানা চালু হওয়ার ফলে সালফেট অ্যামোনিয়ার উৎপাদন বেড়েছে ১৯৫০-৫১ সালে ৪৬৩০৪ টনের তুলনায় ১৯৫২-৫৩ সালে ২৫২০০০ টনে।

৯। চিত্তরঞ্জনের কারখানায় এঞ্জিন তৈরি শুরু হয়েছে।

১০। বোম্বাইয়ে তুইটি তেল সংশোধক কারখানার কাজ শুরু করেছে মার্কিন ও বিলেতি কোম্পানি তুটি। এ ছাড়া বিশাখাপট্টমে আর একটি তেল সংশোধক কারখানা তৈরি করবে মার্কিন ক্যালটেক্স কোম্পানি।

১১। ১৯৫৩ সালে ভারতে টেলিফোন যন্ত্র তৈরি শুরু হয়েছে। বাস্তবিক ৪০ হাজার যন্ত্র তৈরি হবে বলে আশা হচ্ছে।

১২। ১৯৫৪ সালে নিম্নলিখিত কারখানাগুলিতে কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় : মেশিন টুল ফ্যাক্টরি, ইণ্ডিয়ান রেবার আর্থ লিমিটেড, উত্তরপ্রদেশ সরকারের সিমেণ্ট ফ্যাক্টরি, নেপা মিল (কাগজ), একটি পেনিসিলিন ফ্যাক্টরি, একটি ডি-ডি-টি ফ্যাক্টরি, হিন্দুস্তান কেবলস লিমিটেড এবং বিহার সরকারের সুপার ফসপেট কোম্পানি।

১৩। ম্যালেরিয়া রোগের বিরুদ্ধে আরও শতকরা ৫০ ভাগ বেশি জনসাধারণকে রক্ষা করার বন্দোবস্ত হয়েছে ১৯৫০-৫১ এর তুলনায়।

১৪। ভারতের উপকূল বাণিজ্যে যে সমুদ্রগামী নৌকা ইত্যাদির ব্যবহার হয় তা ১৯৫০-৫১ সালে সর্বতোভাবে ভারতীয়দের হাতে আসে।

কমিউনিটি প্রোজেক্ট

ভারত সরকার ও মার্কিন সরকারের সহযোগিতায় ভারতের গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা। ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু হয়। ৫৫টি এলেকায় এই পরিকল্পনা শুরু হয়েছে এবং মোটমাট ১৮ হাজারের কিছু বেশি গ্রামে প্রথম পর্যায়ে কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হয়।

বিভিন্ন এলেকায় সেই এলেকার জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার সমাধান করাই এই পরিকল্পনার প্রচারিত উদ্দেশ্য।

ভারত সরকার এই কাজে মার্কিন সরকার ছাড়া মার্কিন দেশের কোর্ড ফাউণ্ডেশন নামক সংগঠনেরও সাহায্য গ্রহণ করেছে।

চুক্তি অনুসারে মার্কিন সরকার ও ভারত সরকার প্রত্যেকে দেবে ২৫ কোটি টাকা প্রথম কিস্তি হিসেবে। গ্রাম উন্নয়নের জন্যে এই পরিকল্পনা অনুসারে মোট খরচ হবে ৬৫ কোটি টাকা আর মার্কিন সরকার ও ভারত সরকারের প্রতি-নিধিদের উভয়ের ওপর এই টাকা খরচের দায়িত্ব থাকবে। এই ব্যাপারে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় দেড় কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে।

নদী উপত্যকা পরিকল্পনা

ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা অথবা ভারতের বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দেওয়া ও বৈদ্যুতিক শক্তি ও জল সেচনের জন্যে নদীগুলির জলের সদ্ব্যবহার করা একটি বিশেষ জরুরী জায়গা জুড়ে আছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঠিক হয়েছে যে, ১৯৫৭ সালের মধ্যে এইরূপ ১১০টি বাঁধ দেওয়া ইত্যাদির কাজ সম্পূর্ণ হবে।

বর্তমানে যে-সমস্ত কাজে হাত দেওয়া হয়েছে তা শেষ করতে মোট ৮৩০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে মনে করা হয়। এই সব পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ হলে ৮৫ লক্ষ একর জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা ও ১০ লক্ষ কিলোওয়াটের বেশি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়।

॥ ভাকরা-নাঙ্গাল ॥

১৯৫২ সালে কাজ শুরু হয় ও ১৯৫৪ সালের গোড়াতে শেষ হয়। পাঞ্জাব, পেপসু ও রাজপুতানায় ৩৬ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচন ও ৪ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হবে।

॥ হিরাকুদ পরিকল্পনা ॥

ভারতের পূর্বকূলে মহানদীকে বশে আনবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। বন্যা রোধ, প্রায় ২ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও

১৯ লক্ষ একর জমিতে জল সেচনের কাজ করবে। মোট খরচ ৯২ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা হয়।

॥ দক্ষিণ ভারতের বাঁধ ॥

তুঙ্গভদ্রার বাঁধ প্রায় শেষ হয়ে এলো। ১৯৪৫ সালে কাজ শুরু হয় এবং মোট খরচ ৫০ কোটি হবে বলে আশা করা হয়। কিছু জলসেচনের কাজ ১৯৫৩ সালেই হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন হবে ৬৫০০০ কিলোওয়াট আর খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়বে কমপক্ষে ১৪০০০০ টন।

আরও দক্ষিণে কাবেরী নদীর শাখা ভবানী নদীতে বাঁধ বেঁধে জলসেচনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। মোট ২ লক্ষ একরের বেশি জমিতে জল সেচন হবে এবং বছরে কিছুদিনের জন্যে ১০ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়। ১৯৪৮ সালে কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং মোট ৯ কোটির ওপর টাকা খরচ হবে!

॥ মাচকুন্দ পরিকল্পনা ॥

মাদ্রাজ-ওড়িষ্যার মাঝখানে যে মাচকুন্দ পরিকল্পনা, তাতেও কাজ শেষ হলো বলে। অদূর ভবিষ্যতে ১ লাখের বেশি কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হবে বলে আশা করা হয়। মোট খরচ ৮ কোটির বেশি।

তিলাইয়ার বাঁধ ১৯৫৩ সালেই কাজ শুরু করে। এই রকম আরও তিনটি বাঁধ দিয়ে দামোদর নদীকে বশে আনা হবে। একটি হবে মাইথনে, বরাকরকে শাসন করবে। আর একটি পানচেট পাহাড়ে। শেষেরটি কোনারের ওপর দিয়ে। সবকটি মিলে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত করবে। বোকারোতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকারী কারখানা করা হয়েছে তা থেকে ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হবে।

দামোদর পরিকল্পনার ফলে মোট ১৩ লক্ষ ৬ হাজার একর জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা হবে। প্রথম ধাপ শেষ করতে মোট ৯০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে মনে হয় ও মোটমাট ২ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হবে।

রাজনীতি আর অর্থনীতি

'জানবার কথ'ার এই খণ্ড আমরা শুরু করলাম খবরের কাগজের খবর নিয়ে। তারপর দেখা গেলো, আজকের দিনে খবরের কাগজ পড়ে বুঝতে হলে কতকগুলো কথার মানে না বুঝলেই নয়। সাধারণত, খবরের কাগজে সেই কথাগুলো সাঁটে লেখা হয়; আমরা দেখলাম সেগুলোর পুরো নাম আর তাৎপর্য।

কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়।

প্রশ্ন হলো, শুধু ওই নাম কটার মানে জানলেই কি আমরা আজকের দিনে দুনিয়ার খবরটা বুঝতে পারবো? তাও সম্ভব নয়। কেননা আজকের পৃথিবীর প্রধান খবর বিশেষ করে কয়েকটি রাজনৈতিক মতাদর্শ ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে।

রাজনৈতিক কথাবার্তার মধ্যে প্রধানত কী কী নাম পাই? গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ইত্যাদি। আমরা তাই একটু ঘরোয়াভাবে এই মতামতগুলির পরিচয় দিয়ে নিলাম। কিন্তু আলোচনা করতে গিয়ে স্পষ্টই বোঝা গেলো, এই সব রাজনৈতিক মতগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

আজকের দিনে পৃথিবীতে প্রধানত কী কী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা? ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র। আমরা তাই আলোচনা করে নিলাম এই দু-রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথাও।

সেইখানেই শেষ হলো আমাদের সাত নম্বরের বই।

এ-কথা নিশ্চয়ই ঠিক যে রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে যে-সব সমস্যার আলোচনা হলো সেগুলি বড়ো সহজ সমস্যা নয়। তাই নিয়ে আজকের দিনে পৃথিবী সরগরম হয়ে রয়েছে, লেখা হচ্ছে রাশি রাশি বই—মস্ত বড়ো বড়ো সব বই। তাই আমরা যেটুকু বললাম তা ছাড়াও এই সব সমস্যা নিয়ে আরো ঢের ঢের কথা বলবার আছে, লেখবার আছে, আলোচনা করবার আছে।

কিন্তু আমাদের 'জানবার কথা'র উদ্দেশ্য তো আর সব-বিষয়ে সব-কিছু জানবার চেষ্টা নয়। তার বদলে আমাদের উদ্দেশ্য হলো আজকের দিনে একজনের পক্ষে যেটুকু না জানলেই নয় অন্তত সেইটুকু কথা জানবার, আলোচনা করবার। সেই দিক থেকে আমাদের মনে হয়েছে রাজ-নীতি আর অর্থনীতি নিয়ে আজকের দিনে একজনের পক্ষে অন্তত যেটুকু কথা জানা দরকার সেইটুকুর আলোচনা করতে হবে। এইটুকু জেনে কেউই রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে যাবে না নিশ্চয়ই; কিন্তু রাজনীতি বা অর্থ-নীতি সংক্রান্ত খবর শুনলে বিহ্বলও হয়ে থাকবে না।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র কথাটা আজকাল বাজারে খুব চালু। হিটলার-মুসোলিনি মারা যাবার পরে কেউ আজ আর প্রকাশ্যে গণতন্ত্রের বড়ো একটা নিন্দে করে না। বরং সবাই আজকাল নিজেকে গণতন্ত্রী বলে জাহির করতে ব্যস্ত। সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়বে—৪০টা দেশ দখল করে বসে আছে ব্রিটেন। সে বলছে,—আমি খাঁটি গণতন্ত্রী। পৃথিবী ঘিরে যুদ্ধঘাঁটি বসিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেও বলছে,—আমিই আসল গণতন্ত্রী, আর আমার এই যুদ্ধঘাঁটি হচ্ছে রুশ একনায়কত্বের আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বর্ম।

জবাবে রুশিয়া বলছে, তোমাদের গণতন্ত্র হচ্ছে জাল ওষুধের মতো। আনাড়ি লোক দেখে খাঁটি বলে ভুল করে, কিন্তু ব্যবহারে বিপদ।

এই তর্কের একটা হদিশ করতে হলে গণতন্ত্র কথাটার মানে কী, তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

গণতন্ত্র বলতে সাদা কথায় আমরা বুঝি, এমন এক শাসন-ব্যবস্থা যেখানে সকল মানুষেরই সমান অধিকার আছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে আমেরিকা যখন ব্রিটেনের শাসন থেকে মুক্ত হলো তখনকার মার্কিনদেশের রাষ্ট্রপতি অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের মোটামুটি ভালো একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"গণতন্ত্র হচ্ছে জনতার জন্যে জনতার দ্বারা চালিত জনতার সরকার।" A government by the people, for

the people and of the people.

গণতন্ত্রের এই মতবাদ হালের আবিষ্কার নয়, এর পেছনে অনেকদিনের পুরোনো ইতিহাস আছে। কোনো পরোপকারী মহৎ ব্যক্তির মাথা থেকেও এই মতবাদ গজায় নি : সমাজের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে এই মতবাদ জন্ম নিয়েছে, এবং সেই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর চেহারা, অর্থ ও প্রয়োগ বদলেছে।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসদেশে প্রথম আমরা গণতন্ত্রের কথা শুনতে পাই। বস্তুত, গণতন্ত্রের ইংরেজি 'ডেমোক্রেসি' কথাটার উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ 'ডেমস্' অর্থাৎ 'সাধারণ লোক' থেকে।

গ্রীক গণতন্ত্র

॥ গ্রীক যুগ : গণতন্ত্রের আবির্ভাব ॥

প্রাচীন গ্রীক সমাজ মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো। সমাজের শীর্ষে ছিলো অভিজাত শ্রেণী, দেশের বেশির ভাগ জমিরই তারা মালিক। তারপর ছিলো স্বাধীন নাগরিক। তারা চাষবাস বা ব্যবসাবাণিজ্য নিয়েই থাকতো। এরা হলো সাধারণ লোক বা 'ডেমস্'। আর সবচেয়ে নিচে ছিলো ক্রীতদাসেরা। তাদের না ছিলো কোনো সম্পত্তি, না ছিলো কোনো অধিকার। বাড়িঘর, গোরুভেড়া বা আর-পাঁচটা জিনিসের মতো তারাও ছিলো প্রভুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

এই শ্রেণী-বিভাগ থেকে গ্রীসে ক্রমে শ্রেণী-বিরোধ দেখা দেয়। শ্রেণী-বিরোধে সমাজ যাতে ভেঙে না পড়ে তার জন্যে গ্রীসে রাষ্ট্র স্থাপিত হলো। প্রথমে এই রাষ্ট্রশক্তি ছিলো অভিজাতদের হাতের মুঠোয় : স্বাধীন নাগরিকদের ভোট দেওয়া ছাড়া আর কোনোই অধিকার ছিলো না। অভিজাতেরা ব্যবসাবাণিজ্যকে খুবই ছোটো কাজ বলে মনে করতো। ধনসম্পদে বণিকরা যখন অভিজাতদের সমকক্ষ হয়ে উঠলো তখনও অভিজাতেরা তাদের ছোটো নজরে দেখতো, রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখতো। স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে যারা চাষবাস করতো তারাও অভিজাতদের শোষণে জরোজরো হয়ে উঠেছিলো, তাদের জমিজমার অধিকাংশই অভিজাতদের কাছে দেনার দায়ে বন্ধক ছিলো।

অভিজাতদের এই শোষণের ফলে গ্রীসের প্রতিটি নগরীতে শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র হয়ে দেখা দিলো—একদিকে অভিজাত শ্রেণী আর অন্যদিকে বণিকদের নেতৃত্বে ডেমস, অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা। এই লড়াইয়ে যে-সব নগরীতে অভিজাতেরা হেরে গেলো, এথেন্স প্রভৃতি সেইসব নগরীতে এবার গণতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হলো।

খ্রীষ্টের জন্মের ছ শো বছর আগে বিখ্যাত গ্রীক রাষ্ট্রনায়ক সোলন যে গঠনতন্ত্র রচনা করেছিলেন তাতেই আমরা সর্বপ্রথম গ্রীক গণতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট পরিচয় পাই।

শ্রেণী-সংগ্রাম আরও তীব্র হয়ে গ্রাক সমাজকে যাতে ভেঙে না দেয় সেই উদ্দেশ্যে সোলন শোষণের মাত্রাটা একটু কমাবার জন্যে কতোগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। প্রথমে তিনি নিয়ম করে দিলেন, দেনার দায়ে কাউকে গোলাম করে রাখা যাবে না।

স্বাধীন চাষীদের মধ্যে যারা দেনার দায়ে অভিজাতদের গোলাম বনে যাচ্ছিলো এই নিয়ম অবশ্য শুধু তাদের জন্যেই করা হলো। ক্রীতদাসদের কপাল এতে ফিরলো না, তারা যেমন ছিলো তেমনি রয়ে গেলো। এ ছাড়া সোলন স্বাধীন চাষীদের অনেক দেনা মকুব করে দিলেন।

কিন্তু তাই বলে শ্রেণী-বিভাগ তিনি তুলে দেন নি। বরং নতুন শ্রেণী-বিভাগকে তিনি আইনের জোরে আরও পাকাপোক্ত করে দিলেন। শাসনযন্ত্রকে তিনি ঢেলে সাজলেন। সমস্ত স্বাধীন নাগরিকদের সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে চারভাগে ভাগ করা হলো। প্রথম তিন শ্রেণীর ভাগে পড়লো সরকার চালাবার অধিকার। এই পয়সাওয়ালা তিন শ্রেণীর মধ্যে থেকেই শাসনকর্তা, হাকিম বা সেনাপতি নিযুক্ত হবে। আর সবচেয়ে-কম-পয়সাওয়ালা চতুর্থ শ্রেণীর ভাগে পড়লো শুধু জাতীয় পরিষদে ভোট দেবার আর বক্তৃতা করার অধিকার! ক্রীতদাসরা অবশ্য কোনো ভাগেই পড়লো না। তারা যেমন ছিলো তেমনি রইলো।

সোলনের নববিধানে শ্রেণী-সংগ্রামে পরাস্ত অভিজাতেরা শাসনযন্ত্রে তাদের একচেটিয়া অধিকার হারালো, আর শ্রেণী-সংগ্রামে জয়ী বণিক ও ধনী চাষীরা অভিজাতদের সঙ্গে সমান অধিকার পেলো। তাই সোলনের গণতন্ত্র হচ্ছে অভিজাত, বণিক ও ধনী চাষীদের গণতন্ত্র। গরিব চাষীরা স্বাধীন নাগরিক হয়েও ভোট দেওয়া আর জাতীয় পরিষদে গলাবাজি করা ছাড়া অন্য কোনো অধিকার পেলো না। আর ক্রীতদাসদের কপালে এই অধিকারটুকুও জুটলো না। আধুনিক কালের গণতন্ত্রের

প্রকৃত চেহারা চিনতে হলে গ্রীক গণতন্ত্রের এই চরিত্রটি ভালো করে বোঝা দরকার।

গ্রীক গণতন্ত্র শোষক শ্রেণীগুলির মধ্যে অসাম্য অনেকখানি দূর করলো সত্য, কিন্তু সমাজের মূল শ্রেণী-সম্পর্কের কোনো রদবদল করলো না। গ্রীক সমাজের ভিত্তি ছিলো দাসপ্রথা। অভিজাত ও ধনী চাষীদের জমিতে ফসল ফলতো এই দাসদের শ্রমে। বণিকদের বিভিন্ন পণ্য ও জাহাজ তৈরি হতো দাসদের হাড়ভাঙা খাটুনিতে। এক কথায়, গ্রীসের যাবতীয় ধনদৌলত সৃষ্টি করতো এই দাসেরা। কোনো কোনো গ্রীক রাষ্ট্রে স্বাধীন নাগরিকদের চেয়ে দাসরাই ছিলো সংখ্যায় বেশি। কিন্তু তবুও রাজ্যশাসনে অংশীদার হওয়া দূরের কথা, মামুলি ভোটের অধিকারও তাদের ছিলো না। তাই গ্রীক গণতন্ত্র আসলে দাসতন্ত্রই এবং দাসদের যারা মালিক তারা রাষ্ট্রযন্ত্রেরও মালিক ছিলো।

প্রাচীন গ্রীসের পণ্ডিতরা এই দাসপ্রথাকে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম বলে সমর্থন করেছেন। মহাপণ্ডিত প্লেটোর মতে পরস্পরের চাহিদা মেটাবার তাগিদে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের শ্রমের ভাগাভাগি করে নেয়। তাঁর মতে, এই স্বাভাবিক শ্রমবিভাগ থেকেই রাষ্ট্রের জন্ম। শ্রমবিভাগ বলতে তিনি বুঝেছেন শাসক ও শাসিতের মধ্যে শ্রমবিভাগ। তাঁর মতে, শাসিতরা আজন্মকাল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধনদৌলত সৃষ্টি করে যাবে, আর শাসকদের একদল রাষ্ট্র চালাবে, আর একদল সেনাপতি হয়ে রাষ্ট্র রক্ষা করবে। প্লেটো অবশ্য অভিজাত এবং বণিক ও ধনী চাষীদের সমান অধিকারেরও পক্ষপাতী ছিলেন না।

অভিজাতদের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর মতবাদ অভিজাত, বণিক, ধনী চাষী নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর দাস-মালিকদের মহা সুবিধা করে দিলো।

প্লেটোর শিষ্য আরিষ্টটল ব্যবহারিক দিক থেকে একটু নরম গোছের গণতন্ত্রের (যার নাম তিনি দিয়েছেন পলিটি) কার্য-কারিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু দাসপ্রথার বেলায় তাঁর মত গুরুর চেয়ে প্রবল ছিলো। তাঁর মতে দাসত্ব করার জন্যেই অনেক মানুষের জন্ম এবং এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

দাসপ্রথার দুর্বল অবলম্বনে গড়ে ওঠা গ্রীক গণতন্ত্র বেশি দিন টিকলো না। দাসপ্রথার সীমাবদ্ধ বিকাশের সম্ভাবনা যখন ফুরিয়ে এলো তখন নিষ্পেষিত দাসদের বিদ্রোহ, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শক্তিশালী মাসিডনের আক্রমণে গ্রীক গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটলো।

॥ মধ্যযুগ ঃ গণতন্ত্রের তিরোভাব ॥

গ্রীক গণতন্ত্রের মৃত্যুর দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত গণতন্ত্রের নাম আর শোনা গেলো না। ইতিহাসে এই যুগকে বলে সামন্ততন্ত্রের যুগ।

এই যুগে রাষ্ট্র ছিলো জমিদার বা সামন্তপ্রভুদের হাতের মুঠোয়। রাজা ছিলো এই সামন্তকুলের মোড়ল বা প্রধান। এই যুগে সমাজের যা-কিছু ধনদৌলত তার সবই উৎপাদন করতো একদিকে জমিদারদের ভূমিদাস অন্যদিকে কুটিরশিল্পে নিযুক্ত ছোটো ছোটো কারিগরেরা। এদেরই শ্রমের ওপর সামন্ততান্ত্রিক

সমাজ দাঁড়িয়ে ছিলো।

['জানবার কথা'র তৃতীয় খণ্ডে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয়। এই ভাঙনের মধ্যে দিয়ে যে নতুন যুগের সৃষ্টি হলো ইতিহাসে তা বণিক যুগ নামে পরিচিত। এই বণিক যুগকে আমরা আধুনিক কালের ধনিক যুগ বা ধনতন্ত্রের (Capitalism) আদিকাল বলতে পারি। গ্রীক গণতন্ত্রের মৃত্যুর পরে এই যুগের শেষের দিকে গণতন্ত্রের ভাবধারা আবার নতুন করে জন্ম নেয়। অবশ্য ধনিক যুগ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নবজাত গণতান্ত্রিক ভাবধারাও সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি।

সমাজের এতো ওলটপালটের পরে কালের এই বিরাট ব্যবধান অতিক্রম করে গণতান্ত্রিক ভাবধারার পুনরাবির্ভাব ঘটলো কী করে? এর কারণ কি এই যে, মানুষ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অব্যবস্থা ও জুলুম দেখে আপনা থেকেই গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বুঝে ফেলেছিলো? ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে নতুন যে ধনিক শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠছিলো তাদের বিকাশ ও অগ্রগতির জন্যে গণতন্ত্র না হলে চলছিলো না। তাই এতো কাল পরে আবার নতুন করে গণতান্ত্রিক ভাবধারার আবির্ভাব হলো।

গণতন্ত্র না হলে ধনিক শ্রেণীর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না কেন? আর কেনই বা ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক ভাবধারারও বিকাশ ঘটলো? এই প্রশ্নের জবাব

ইতিহাসের পাতাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

বণিক যুগে ইউরোপীয় বাণিজ্যের বিপুল প্রসার হলো। বাণিজ্যের তাগিদে বণিকদের নেতৃত্বে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হলো এবং ক্রমে ক্রমে সেই সব দেশে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিতে লাগলো। এই বণিক যুগেই ইংরেজ বণিকদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলো।

ব্যবসার একচেটিয়য়া অধিকার, নতুন আবিষ্কৃত দেশগুলি কে আগে দখল করবে ইত্যাদি নানান প্রশ্নে বিভিন্ন দেশের বণিকদের মধ্যে ক্রমেই তীব্র প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ শুরু হলো। এই অবস্থায় নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যে প্রত্যেক দেশের বণিকদের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়লো জাতির ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়া এবং এমন এক রাষ্ট্র গঠন করা যে রাষ্ট্র অন্য দেশের প্রতিযোগী বণিকদের বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে।

কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো বণিকদের এই স্বার্থের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। সামন্তযুগে বিভিন্ন রাজ্যগুলি জাতির ভিত্তিতে ছিলো না। একই জাতির লোকেরা বিভিন্ন রাজ্যের অধীনে বাস করতো। সামন্তপ্রভুদের চিন্তায় জাতীয়তাবোধের কোনো স্থান ছিলো না। সমস্ত ইউরোপকে তারা এক অখণ্ড খ্রীষ্টান সমাজরূপে দেখতো। অন্য জাতির অভিজাতদের তারা সগোত্র বলে মনে করতো। সামন্তযুগের এই জাতি-হীন চিন্তাধারা ও রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে উদীয়মান বণিক শ্রেণীর শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাত বাধলো। এই সংগ্রামে বণিক শ্রেণীর জয় হলো, নির্দিষ্ট

জাতীয় এলাকার মধ্যে বণিক শ্রেণীর প্রভাবাধীন স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন শুরু হলো। সেই যুগে ইতালির মেকিয়াভেলি ও গ্রটিয়াস্ ছিলেন এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের সবচেয়ে বড়ো প্রচারক।

এই জাতীয় রাষ্ট্রগঠন গণতান্ত্রিক ভাবধারার জন্ম ও প্রসারের পথ অনেকখানি সুগম করে দিলো। যদিও এই রাষ্ট্রগুলি গঠিত হলো বণিক শ্রেণীর স্বার্থে, তবুও এর মধ্যে দিয়ে অনেক জায়গায় সাধারণ মানুষ বিদেশী রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্তি পেলো, তাদের মধ্যে জন্ম নিলো জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র আত্মশাসনের চেতনা। তাই সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণীর লড়াই প্রতিদেশেই জাতীয় সংগ্রামের রূপ নিয়েছে। এমন কি ফ্রান্স প্রভৃতি যে-সব দেশে বিদেশী সামন্তপ্রভুদের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার কোনো সমস্যা ছিলো না সেখানেও ধনিক শ্রেণীর লড়াইয়ে শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদের জোয়ার দেখা গেছে। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক রুসো দেশপ্রেমকে মানুষের সব গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ বলেছেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রাণমাতানো গান 'লা মার্সাই'-এর প্রতি ছত্রে রয়েছে দেশপ্রেমের প্রবল আহ্বান।

কিন্তু সতেরো শতাব্দীর গোড়া থেকেই শক্তিশালী ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির রাজাদের সংঘর্ষ বেধে গেলো। এই সংঘর্ষের মধ্যেই গণতান্ত্রিক ভাবধারা আরও স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ নিলো। জাতীয়-রাষ্ট্রগুলি গঠনের প্রথম দিকে রাজাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা ধনিক শ্রেণীর সুবিধাই করে দিচ্ছিলো। দেশের মধ্যে

রাজশক্তি সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করে ধনতন্ত্রের পথ খুলে দিচ্ছিলো, আর বিদেশে অন্য-দেশীয় প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে স্বদেশের ধনিকদের স্বার্থ রক্ষা করছিলো। অন্যদিকে আবার শক্তিশালী ধনিক শ্রেণীকেও রাজার প্রয়োজন ছিলো। যুদ্ধবিগ্রহ বা দেশশাসনের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যে রাজাকে প্রধানত এই ধনিকশ্রেণীর ওপরই নির্ভর করতে হতো, কারণ সামন্তপ্রভুদের তখন পড়তি অবস্থা, আর এই ধনিকদের হাতে ব্যবসাবাণিজ্য ও দেশবিদেশের লুণ্ঠিত সব ধনসম্পদ।

কিন্তু এই মিতালি বেশিদিন টিকলো না। একচ্ছত্র রাজশক্তি চাইলো সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে, সবকিছুর ওপর হুকুম খাটাতে। আর ধনিক শ্রেণী চাইলো নিজেদের ইচ্ছে ও স্বার্থমতো ব্যবসাবাণিজ্য চালাতে বা শিল্প গড়ে তুলতে। রাজা তার খুশি-মতো একে ওকে কোনো ব্যবসা বা শিল্পে একচেটিয়া অধিকার দিতো। তার ফলে, সেই অনুগৃহীত ব্যক্তিটি ছাড়া ধনিক শ্রেণীর আর সকলেরই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতো। তাই তারা দাবি করলো, ব্যবসাবাণিজ্যে বা শিল্পে ধনিকশ্রেণীর সকলের সমান অধিকার চাই, এ ব্যাপারে রাজার হাত দেওয়া চলবে না। তারা আরও দাবি করলো, বেশির ভাগ ট্যাক্স যখন আমরা দিই তখন রাজাকে আমাদের কথা শুনে রাজ্য চালাতে হবে। ইংল্যাণ্ডে ধনিকদের এই দাবির জবাবে রাজা প্রথম জেমস্ বললেন, "ঈশ্বরের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া যেমন মানুষের পক্ষে মহাপাপ, রাজার কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়াও প্রজার পক্ষে তেমনি মহা রাজদ্রোহ। এ আমি কোনো রকমেই সইবো না।"

কিন্তু ধনিক শ্রেণী রাজার এই একচ্ছত্র অধিকার কিছুতেই মানতে রাজি হলো না, তারা দাবি ধরে রইলো : প্রজার স্বার্থ ও অধিকার যেসব বিষয়ে জড়িত সেইসব বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার নির্বাচিত পার্লামেণ্টকে দিতে হবে।

এই নিয়ে রাজশক্তি ও ধনিকশ্রেণীর মধ্যে বেধে গেলো মহা সংঘর্ষ। ইংল্যাণ্ডে এই সংঘর্ষ চূড়ান্ত রূপ পেলো ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে রাজশক্তির বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে। আর ফ্রান্সে এই সংঘর্ষ ফরাসী বিপ্লবের আকারে ফেটে পড়লো ১৭৮৯ সালে।

এই দুই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিলো উদারনীতির সুবিখ্যাত মতবাদ।

ইংল্যাণ্ডে উদারনীতির মতবাদের প্রথম লক্ষ্য ছিলো অবাধ রাজশক্তিকে কতোগুলি নিয়মের মধ্যে বেঁধে দিয়ে বশে আনা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো, পার্লামেণ্টে সামন্তপ্রভুদের অধিকার খর্ব করা। এই উদ্দেশ্যে উদারনীতির সমর্থকেরা দাবি তুললেন : সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটের অধিকারের নিয়ম বদলাতে হবে, রাজাকে পার্লামেণ্টের মত নিয়ে চলতে হবে, ভোটের অধিকার না দিয়ে ট্যাক্স বসানো চলবে না ইত্যাদি। উদারনীতিবাদীদের মধ্যে যারা একটু বেশি উদার তারা দাবি করলো, সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোককে ভোটের অধিকার দিতে হবে। এ ছাড়া, স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ ও স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার প্রভৃতি কয়েকটি অধিকার আইনসম্মত অধিকার বলে মেনে নেবার দাবিও উদারনীতিবাদীরা করলো।

ফ্রান্সে উদারনীতির মতবাদ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে মানুষের

অধিকার ঘোষণায় আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

উদারনীতির এই মতবাদের মধ্যে, গণতান্ত্রিক ভাবধারা আরও পূর্ণতা লাভ করে। আজকাল গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে সাধারণত যা বুঝি তার অনেকগুলিই—যেমন, সকলের ভোটের অধিকার, সুনির্দিষ্ট আইনমাফিক রাষ্ট্র পরিচালনা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সেই আইন রচনার অধিকার, মত পোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি—উদারনীতির যুগের সৃষ্টি। তাই এই মতবাদ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে বিরাট অগ্রগতি।

কিন্তু অন্যান্য অত্যাচারিত শ্রেণী এই মতবাদের ফলে উপকৃত হওয়া সত্ত্বেও উদারনীতি ধনিক শ্রেণীরই মতবাদ ছিলো।

প্রশ্ন উঠবে—এ কী করে সম্ভব? যে মতবাদ সকল শ্রেণীর উপকার করে তা শুধুমাত্র এক শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির মতবাদ হয় কী করে?

হতে যে পারে, তার প্রমাণ ইতিহাস। বন্যার জল অনেক সময় পলিমাটি এনে জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাই বলে কেউ বলবে না যে, বন্যা ভালো। কারণ বন্যাতে ধ্বংসটাই প্রধান, পলিমাটি আনার ব্যাপারটা প্রাসঙ্গিক। উদার নীতির মতবাদে তেমনি ধনিক শ্রেণীর স্বার্থটাই প্রধান, অন্যদের যা উপকার হয়েছে তা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য ছিলো বলেই হয়েছে এবং অন্যদের স্বার্থের সঙ্গে যখন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধ বেধেছে তখন ধনিক শ্রেণী তার সমস্ত উদার ঘোষণা ভুলে গিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে অন্যদের দাবিয়ে

দিতে একটুও ইতস্তত করে নি।

উদাহরণ হিসেবে ইংল্যাণ্ডের কথাই ধরা যাক। রাজা চার্লসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধনিকশ্রেণী দাবি তুললো, বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা চলবে না, ভোটের অধিকার না দিয়ে কারুর ওপর ট্যাক্স বসানো চলবে না ইত্যাদি। একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ধনিক শ্রেণী নিজের স্বার্থে সেদিন এই দাবি তুলেছিলো এবং এই দাবি আদায়ের ফলে ধনিকশ্রেণী ছাড়াও অন্যান্য অত্যাচারিত শ্রেণীরা উপকৃত হয়েছিলো। কিন্তু ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে শাসনক্ষমতা দখল করার পর এ-সব দাবির কথা তাদের আর মনে রইলো না। বরং আরও বেশি লোককে ভোটের অধিকার দেওয়া হোক বলে দাবি করার জন্যে 'লেভেলার' নামে পরিচিত ক্রমওয়েলের সৈন্যদলের একাংশের আন্দোলনকে তারা নিষ্ঠুরভাবে দমন করলো। 'লেভেলার'রা সকলের ভোটের অধিকার চায় নি। মেয়ে-শ্রমিকদের বাদ দিয়ে ২১ বছর বয়স্ক সকলের ভোটের অধিকার তারা দাবি করেছিলো মাত্র। কিন্তু এরই জন্যে এই আন্দোলনের নেতা ক্রমওয়েলের সৈন্যদলের অন্যতম প্রধান সেনাপতি লিলবার্নকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হলো এবং পরে বিচারে মুক্তি পাবার পরে পার্লামেণ্টে বিশেষ আইন পাশ করে তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধনিকশ্রেণী নিজেদের জন্যে যে ভোটের অধিকার দাবি করেছিলো সকলের জন্যে সেই একই অধি-কার দাবি করার অপরাধে শুধু 'লেভেলার'রাই নয়, আরও অনেকে

রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধনিকশ্রেণীর হাতে নির্যাতিত হয়েছে। এদের মধ্যে টম পাইনের পরিচালিত আন্দোলন এবং চার্টিষ্ট আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টম পাইনের আন্দোলন দমন করার জন্যে ধনিক শ্রেণীর সরকার বিনা বিচারে আটক করার আইন চালু করলো। অথচ ক্ষমতা দখলের আগে রাজা চার্লসের কাছে তারা যে দাবির সনদ (Petition of Rights) পেশ করেছিলো তাতে অন্যতম প্রধান দাবি ছিলো, বিনা বিচারে কাউকে আটক করা চলবে না। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধনিক শ্রেণীর আর একটা দাবি ছিলো, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু পাইনের আন্দোলন দমন করার জন্যে তারা তাঁর বিখ্যাত বই 'মানুষের অধিকার' (The Rights of Man) বাজেয়াপ্ত করে দিলো, আর আন্দোলনের পত্রিকা 'পলিটিক্যাল রেজিষ্টার' ও 'ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ'-এর প্রত্যেকখানা কাগজের ওপর ৪ পেনি করে (প্রায় চার আনা) ট্যাক্স বসালো যাতে কাগজ কেউ কিনতে না পারে। আর এতেও যখন কুলালো না তখন ম্যাঞ্চেষ্টারে ৮০,০০০ লোকের এক সভায় ঘোড়সওয়ার ছেড়ে দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে এগারো জনকে হত্যা করলো, আর চার-শোরও বেশি লোককে জখম করলো—তার মধ্যে এক-শো জন মেয়ে।

চার্টিষ্ট আন্দোলনে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মতবাদের আসল চেহারাটা আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। গৃহযুদ্ধের পরে ধনিকশ্রেণী সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে যে আপোস করেছিলো তার ফলে পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদ 'হাউস অব লর্ডস'-এ সামন্তপ্রভুদের

প্রভাব ও ক্ষমতা অনেকখানি টিকে গিয়েছিলো। রাজা হাউস অব লর্ডসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেক সময় ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতো। ইতিমধ্যে নতুন নতুন কলকারখানা আবিষ্কার ও শিল্পের প্রসারের ফলে ধনিক শ্রেণীর ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। তারা এখন হাউস অব লর্ডসের ক্ষমতা সংকুচিত করতে চাইলো। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩২ ও ১৮৬৭ সালে তারা প্রথম ও দ্বিতীয় রিফর্ম বিল নামে দুটি আইন পাশ করে। হাউস অব লর্ডসের এবং তাদের সঙ্গে স্বার্থের বন্ধনে জড়িত গোঁড়া রক্ষণশীল ধনিকদের বাধা ভেঙে এই বিল দুটি পাশ করবার জন্যে ধনিক শ্রেণী সেদিন শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য প্রার্থনা করে। আর সাহায্যের বিনিময়ে আরও বেশিসংখ্যক লোককে ভোটের অধিকার দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। হাউস অব লর্ডসের ক্ষমতা খর্ব করা ও ভোটের অধিকার বাড়ানো শ্রমিক শ্রেণীরও দাবি। তাই এই বিল পাশ করার জন্যে তারা কোমর বেঁধে আন্দোলন শুরু করে। বস্তুত শ্রমিকদের জোরেই বিলদুটি দুবার বাতিল হবার পরেও শেষপর্যন্ত পাশ হয়ে যায়। কথায় বলে, "কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী"। ধনিক শ্রেণী এই প্রবাদবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো। বিলদুটি যখন পাশ হলো তখন দেখা গেলো শ্রমিক শ্রেণীর কোনো দাবিই মেটে নি। প্রথম বিলে ভোটার-সংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ বাড়লো সত্য। কিন্তু মোট জনসংখ্যার প্রায় আশি ভাগ তখনও ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত রইলো। দ্বিতীয় বিলে আরো কিছু লোক ভোটের অধিকার পেলো বটে, কিন্তু কৃষি-মজুররা সকলে এবং খনি ও কলকারখানার মজুরদের একটা

মস্ত বড়ো অংশ ভোটের অধিকার পেলো না! শুধু তাই নয়, বেকার শ্রমিক ও গরিবদের সরকার থেকে যে সাহায্য ও ভাতা দেওয়া হতো আইন করে তা প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হলো।

গণতন্ত্রের প্রতি ধনিক শ্রেণীর কোনো নিষ্ঠা নেই বুঝতে পেরে শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের চেষ্টাতেই গণতন্ত্রের নীতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এগুলো। সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের অধিকার, পার্লামেণ্টে সভ্য হতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের মালিক হতে হবে এই নিয়ম বাতিল করার দাবি, ইত্যাদি ছটা দাবি নিয়ে তারা আন্দোলন শুরু করলো। সারা দেশে তখন ভোটারের মোট সংখ্যা ছিলো ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার, আর চার্টিষ্টদের এই দাবির সমর্থনে সই দিলো ১২ লক্ষ ৮০ হাজার লোক। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধনিক শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানতে হবে বলে দাবি তুলেছিলো। কিন্তু সমস্ত দেশের মোট ভোটার সংখ্যার দেড়গুণেরও বেশি লোক যখন এই দাবি জানালো তখন কিন্তু ধনিক শ্রেণী তা মানলো না। বরং দেড় হাজারের বেশি লোককে গ্রেপ্তার করে এবং সৈন্য ও পুলিস লাগিয়ে আন্দোলনকে ভেঙে দিলো।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধনিক শ্রেণী নিজেদের জন্যে সংগঠিত হবার অধিকারও দাবি করেছিলো। কিন্তু হাতে ক্ষমতা পাবার পর স্বেচ্ছায় অন্যদের এই অধিকার দিতে তারা রাজী হয় নি। ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়া আইনত বে-আইনি ছিলো ১৮২৪ সাল পর্যন্ত, আর কার্যত বে-আইনি ছিলো ১৮৭১ পর্যন্ত।

ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সেও একই অবস্থা আমরা দেখতে পাই। বিপ্লবের পরে 'কোড নেপোলিয়ন' নামে পরিচিত আইন চালু হবার পর ফরাসী দেশে 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'র অর্থ দাঁড়ালো সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে ধনিক শ্রেণীর সমান অধিকার, ধনিক শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী এবং তাদের ধনলুণ্ঠনের স্বাধীনতা।

গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্ম ও অগ্রগতির এই ইতিহাস থেকে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, সমাজের বিকাশের কোনো কোনো স্তরে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রচলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, যেমন পড়েছিলো প্রাচীন গ্রীসে এবং তারপরে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে যাবার পরে ইউরোপে। এই ইতিহাস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, সমাজের উৎপাদন প্রণালীর মালিকানা যখন যে-শ্রেণীর হাতে থাকে, অর্থাৎ যে-শ্রেণী যখন সমাজে প্রধান, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তখন তাদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। এই কারণেই সামন্তপ্রভুদের পরাজয়ের পরে সতেরো শতাব্দী থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হলো তা ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্র, কারণ তারাই হলো এখন সমাজে প্রধান। এই ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্রই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে চলছে।

বর্তমান ধনিক গণতন্ত্র

বর্তমান গণতন্ত্রকে ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্র বলতে অনেকেই অবশ্য আপত্তি করবেন। তাঁরা বলবেন, সতেরো, আঠারো বা

উনিশ শতকে ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্রের ওপর অনেকখানি কর্তৃত্ব করতে পারলেও এখন আর তা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসারের ফলে বর্তমান গণতন্ত্র আর ধনিকের গণতন্ত্র নেই, এই গণতন্ত্র সকলের। এখানে সকলেরই সমান অধিকার, আইনের চোখে সবাই সমান। এখানে ধনী-গরিব-নির্বিচারে প্রত্যেকেই ভোট দিয়ে গবর্নমেণ্ট নির্বাচিত করে, আবার সেই গবর্নমেণ্টকে পছন্দ না হলে তাকে ভোট না দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারে। কারু বেশি পয়সা আছে বলে যে সে বেশি ভোট দেবে এখানে তার উপায় নেই। আবার উপযুক্ত পরিমাণ ভোট পেলে এখানে সবাই লোকসভার সদস্য বা গবর্নমেণ্টের মন্ত্রীও হতে পারে। আইনত ধনীদের জন্যে এখানে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই। বর্তমান গণতন্ত্রের সমর্থকরা বলবেন, এই যেখানে নিয়ম, সেখানে বর্তমান গণতন্ত্রকে শুধু ধনিকের গণতন্ত্র বলবো কোন বুদ্ধিতে, কী বিচারে?

এই গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোর চরিত্রটা একটু বিচার করে দেখা যাক এর কতোখানি খাঁটি, কতোখানি মেকি। প্রথমে ভোটের কথাটাই ধরা যাক। বলা হয় বর্তমান গণতন্ত্রে সবাই স্বাধীনভাবে ভোটে দাঁড়াতে পারে, আর সবাই স্বাধীনভাবে ভোটও দিতে পারে। এই কথাটা কতোখানি সত্যি?

ধরো তুমি মস্তবড়ো একজন ধনীর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ালে। তোমার পয়সা না থাকলেও তুমি ভোটে দাঁড়াতে পারবে, কেউ তোমাকে আটকাবে না—এ-কথা সত্যি। কিন্তু তারপর? প্রথমেই সমস্যা উঠবে পয়সা কোথায়। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর

অনেক পয়সা, সে হাজার হাজার টাকা খরচা করছে। আর তোমার পয়সা নেই, তুমি খরচা করতে পারছো বড়োজোর কয়েক শ। তার পর ভোটে জিততে হলে ভোটারদের কাছে প্রচার করতে হবে। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ধনিক শ্রেণীর লোক। খবরের কাগজগুলো প্রায় সব তাদের হাতে। তুমি যদি মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের লোক হও, তাহলে তোমার পক্ষে লিখবে একটি বা ছুটি কাগজ। আর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে লিখবে ধনকুবের হার্ষ্ট, স্ক্রিপস-হাওয়ার্ড ও লুসের কয়েক ডজন পত্রিকা। তুমি যদি বিলেতের লোক হও, তাহলেও তোমার পক্ষে ছু-একটির বেশি পত্রিকা পাবে না, আর তোমার বিরুদ্ধে লিখবে লর্ড বিভারব্রুক, লর্ড রদারমেয়ার ও মিঃ ইলিয়াসের সম্পত্তি প্রায় দেড় ডজন পত্রিকা। এদেশেও এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী যখন দশটা জয়ঢাক বাজিয়ে ভোটারদের কানে তালা লাগিয়ে দেবে তখন তুমি একটি ছোট্ট একতারা নিয়ে তাদের তোমার বাজনা শোনাবার ব্যর্থ চেষ্টায় হয়রান হবে। তারপর সভা করবে, ইস্তাহার দেবে—তাও মেলা পয়সার ব্যাপার। সেখানেও তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে টেক্কা দিতে পারবে না। ফলে ভোটাররা তোমার কথা শুনতেই পাবে না, শুনতে পাবে শুধু তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা। এই অবস্থায় তার কথা শুনেই তারা মত ঠিক করবে, তাকেই ভোট দেবে এবং তুমি ভোটে হেরে যাবে। এই যেখানে অবস্থা, যেখানে ভোটবৈতরণী পার হবার জন্যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে আছে মস্ত বড়ো জাহাজ আর তোমার আছে কেবল একখানা তালের

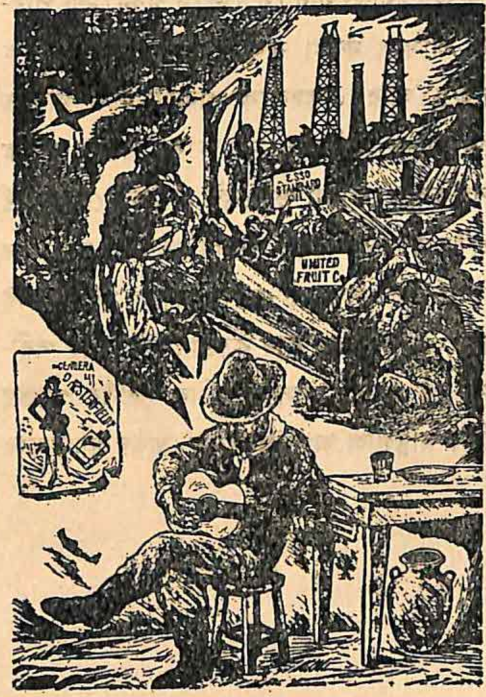
ডিঙি, তাও আবার পয়সার অভাবে দাঁড় কিনতে পারো নি—সেখানে তোমার ভোটে দাঁড়াবার স্বাধীন অধিকার অর্থহীন নয় কি ?

তারপর বলা হয়, সবাইকার স্বাধীনভাবে ভোট দেবার অধিকার আছে। কিন্তু যেখানে ভোটারদের মতগঠনের যতোকিছু যন্ত্র,—যেমন খবরের কাগজ, রেডিও, সিনেমা ইত্যাদি, সবই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ধনিক শ্রেণীর হাতে, সেখানে ভোট দেবার অধিকারকে যতোটা স্বাধীন বলা হয় আসলে তা কি ততোটা স্বাধীন ?

আরও বলা হয়, গবর্নমেণ্টকে যদি পছন্দ না হয় তাকে ভোট দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু এ-কথাটাও কি সত্যি ? পূর্ব-পাকিস্তানে এই সেদিন আমরা দেখলাম, জনসাধারণ ভোট দিয়ে লীগ সরকারকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের মনমতো গবর্নমেণ্ট নির্বাচিত করলো। কিন্তু তারপর হলো কী ? ছ মাস যেতে না যেতেই শাসকশ্রেণী সেই নির্বাচিত সরকারকে তাড়িয়ে দিলো, তাদের মন্ত্রীদের ধরে জেলে পুরলো। শুধু পাকিস্তানেই এরকম ঘটে নি। ১৯৩৬ সালে স্পেনে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত মানুষেরা মিলে ভোট দিয়ে ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর গবর্নমেণ্ট তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের পছন্দমতো গবর্নমেণ্ট বসালো। কিন্তু যেই সেই গবর্নমেণ্ট আইন করে শাসকশ্রেণীর শোষণ কিছুটা খর্ব করলো অমনি আরম্ভ হলো সেই নির্বাচিত গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণীর সশস্ত্র আক্রমণ। অস্ত্রের জোরে ধনিক শ্রেণী জনতার সেই গবর্নমেণ্টকে ভেঙে দিয়ে নিজেদের একচ্ছত্র শাসন কায়েম করলো। এই সেদিন ব্রিটিশ গিয়ানা ও গুয়াতেমালাতেও এরকম ঘটেছে। গিয়ানায়



সৈন্যদের প্রতি ব্রিটিশ সেনাপতি : আমরা কেন গিয়ানায় যাচ্ছি জানো? যাচ্ছি গণতন্ত্রকে বাঁচাতে!



গু য়া তে মা লায়
গণতন্ত্রের সমাধি।

জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত সরকার যেই আখ-বাগিচার ব্রিটিশ মালিক ও বকসাইট খনির মার্কিন মালিকদের শোষণ কিছুটা কমাবার চেষ্টা করলো অমনি ব্রিটিশ সরকার সৈন্য পাঠিয়ে নির্বাচিত গবর্নমেণ্টকে ভেঙে দিলো। গিয়ানার নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ছেদী জগন ও অন্যান্য মন্ত্রীরা আজ জেলে বন্দী। আর গুয়াতেমালার নির্বাচিত সরকার যেই একচেটিয়া মার্কিন কোম্পানি ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির মুনাফায় হাত দিলো অমনি গণতন্ত্রী মার্কিন সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যে অস্ত্রের জোরে সেই সরকারকে ভেঙে দেওয়া হলো। নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীরা আজ কেউ জেলে, কেউ নির্বাসনে। এরকম আরও ঘটনা ইতিহাসে আছে।

এই সব ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, ভোটে গবনমেণ্ট পরিবর্তন করার কথাটা আসলে ফাঁকা কথা। ভোট দিয়ে ধনিক শ্রেণীর একদলকে সরিয়ে আর একদলকে গবর্নমেণ্টের গদিতে বসানো যায়। তাতে অবশ্য আটকায় না, কারণ তাতে ধনিক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ বিপন্ন হবার কোনো ভয় নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে জনসাধারণ ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের ভোটের অধিকার ব্যবহার করে সেই মুহূর্তে এই গণতন্ত্রের চেহারা বদলে যায়। সেই অগ্নিপরীক্ষায় ধরা পড়ে এই গণতন্ত্রে খাদ কতো বেশি, সেই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, এই গণতন্ত্র আসলে ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্র এবং বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আসলে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার মাত্র।

॥ রাষ্ট্র কী ॥

একশ্রেণীর রাজনৈতিক দার্শনিক রাষ্ট্রকে শ্রেণী-স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার বলে,মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে রাষ্ট্র হবে শ্রেণী-নিরপেক্ষ, সকল শ্রেণী-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে সকল শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করাই হচ্ছে রাষ্ট্রের কাজ।

কিন্তু কি ঐতিহাসিক, কি ব্যবহারিক—কোনো দিক দিয়েই এই মতবাদ সত্য নয়।

ঐতিহাসিকভাবে দেখলে দেখা যায় যে, শ্রেণী-সংগ্রাম থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। আদিম মানবসমাজে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলো না। আর সেই কারণে সেই সমাজে শ্রেণী-ভেদও ছিলো না। এবং সেই কারণে আদিম সমাজে রাষ্ট্রেরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে মানবসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তন হলো সেইদিন থেকে শুরু হলো শ্রেণী-সংগ্রাম। আর সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শোষক শ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়লো এমন একটা যন্ত্রের যার সাহায্যে তারা অন্যদের দাবিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে পারবে। শ্রেণী-সংগ্রামের এই যন্ত্রটি হলো রাষ্ট্র। তাই শ্রেণী-সংগ্রামের যুগেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। অন্যদের দাবিয়ে রেখে প্রধান শ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষা করাই রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা। রাষ্ট্র এই শ্রেণীর হাতে অন্যদের দাবিয়ে রাখার যন্ত্র মাত্র। আদর্শবাদী দার্শনিকরা এই সত্যটা না মানলেও ধনিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডাম স্মিথ এ-কথা জানতেন। তাই তিনি খোলাখুলিভাবেই বলে গেছেন, বিত্তহীনদের বিরুদ্ধে বিত্তশালীদের

সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষা করাই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ।

ব্যবহারিক দিক থেকেও রাষ্ট্রের এই চেহারার সঙ্গে প্রতিদিনই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। রাস্তায় বেরুলেই রাষ্ট্রকে আমরা দেখতে পাই লাল পাগড়ি মাথায় পুলিসের বেশে। এই পুলিসের পেছনে আছে থানা, হাজত, ঠাণ্ডিগারদ। তার পেছনে আছে সৈন্য, বন্দুক, কামান ইত্যাদি। রাষ্ট্রের পরিচালকদের যে শ্রেণীস্বার্থ আইন আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই আইন চালু রাখার জন্যে এই বিরাট পীড়ন-যন্ত্র সর্বদাই প্রস্তুত। এই পীড়ন-যন্ত্রের কাজ হচ্ছে সরকারী ভাষায় যাকে বলে "আইন ও শৃঙ্খলা" তা রক্ষা করা।

বর্তমানে ধনিক সমাজে 'আইন ও শৃঙ্খলার' মানে কী? একটা উদাহরণ ধরা যাক।

১৯৫৩-৫৪ সালে ব্রিটিশ সরকারের বাজেটে ধনিক শ্রেণীর জন্যে ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ৩৪২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা) ট্যাক্স মকুবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই টাকা ধনিক শ্রেণীর সরাসরি লাভ হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সরকারী তহবিলে আমদানি একই হারে কমলো। সুতরাং সরকারের তহবিলে আমদানির অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। উপায় কী? জনসাধারণের জন্যে যে ব্যয় হয় তা কমাও। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের খাদ্য ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হতো তা থেকে ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ২৫২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা) কমিয়ে দেওয়া হলো। এখন ব্রিটেনের জনসাধারণ যদি বলে, আমাদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যের জন্যে ব্যয়বরাদ্দ কমাতে আমরা দেবো না তাহলেই ব্রিটিশ সরকার বলবে, তোমরা রাষ্ট্রের আইন অমান্য করছো, দেশের শৃঙ্খলা

ভাঙছো। কিন্তু রাষ্ট্রের শীলমোহর থাকা সত্ত্বেও আইনটা আসলে কার? যে ধনিক শ্রেণীর ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড লাভ হলো তাদের। তাদের স্বার্থে তৈরি এই আইন চালু করার জন্যে দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার দোহাই দিয়ে সরকার জনসাধারণের আন্দোলন দমনের জন্যে পুলিস পাঠাবে, ফৌজ লাগাবে। সুতরাং বর্তমান ধনিক সমাজে 'আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষার অর্থ হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ ও শোষণক্ষমতা রক্ষা করা। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার বিরাট পীড়ন-যন্ত্রকে এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করছে।

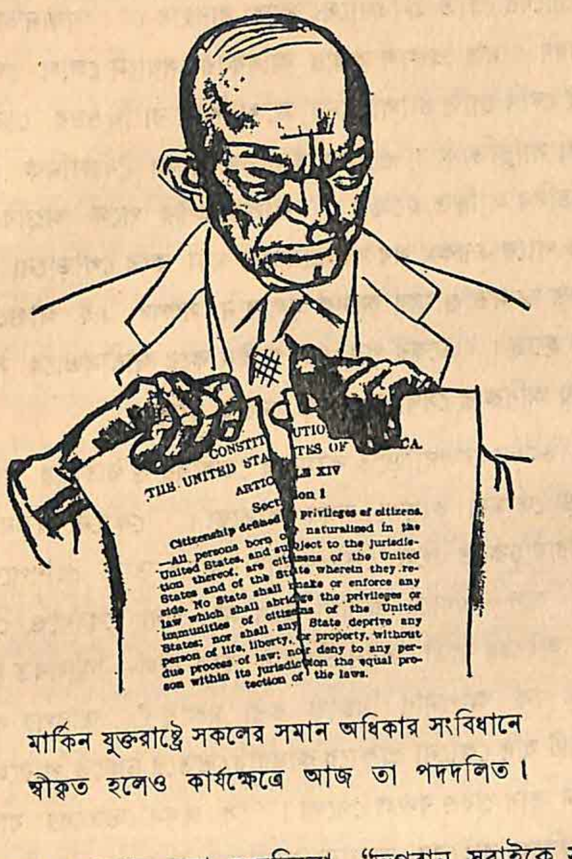
প্রশ্ন উঠবে, রাষ্ট্রকে এইভাবে শুধু মাত্র শ্রেণীস্বার্থ-রক্ষার পীড়ন-যন্ত্র হিসাবে দেখা অন্যায়। কেননা, বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবিধ জনহিতকর কাজেরও দায়িত্ব নেয়। এ ছাড়া, বর্তমান গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র আইন করে তার নাগরিকদের মত প্রকাশের ও সংঘ-বদ্ধ হবার স্বাধীনতা দিয়েছে। রাষ্ট্র শুধু যদি শ্রেণীস্বার্থরক্ষার পীড়ন-যন্ত্রই হবে তবে নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিয়ে রাষ্ট্র কেন তার পীড়ন-ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেবে?

এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্মবৃত্তান্ত একটু জানা দরকার। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যে-সব ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার প্রচলিত আছে তার অধিকাংশই প্রতি-ষ্ঠিত হয়েছে সতেরো থেকে উনিশ শতাব্দীর মধ্যে। যেমন, বিনা বিচারে কাউকে আটক করা চলবে না বলে নাগরিকের যে-অধি-কার আজ অনেক দেশে প্রচলিত আছে তা ইংল্যাণ্ডে প্রথম

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে। অবাধে সভা করা বা সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকারও ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশ শতাব্দীর শেষের দিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ-সব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সাঙ্গ হবার পর।

সেদিন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে ধনিক-শ্রেণীকে অন্যান্য শোষিত শ্রেণীকেও পক্ষে টানতে হয়েছিলো। তাই সেই সংগ্রামে ধনিক শ্রেণী নিজের জন্যে যে-সব অধিকার আদায় করেছিলো তা থেকে অন্যদের একেবারে বঞ্চিত রাখতে পারে নি। কিন্তু তারপর সেই অধিকারগুলো বজায় রাখা এবং আরো নতুন অধিকার অর্জনের জন্য জনসাধারণকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। যেমন, সভা করা ও সংঘবদ্ধ হবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে খাস লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে ১৮৮৭ সালে পর্যন্ত পুলিসের লাঠিতে ব্রিটেনের সাধারণ মানুষের রক্ত ঝরেছে।

তাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই। তারা বরং এই প্রাচীন অধিকারগুলো কেড়ে নিতেই ব্যস্ত। বিনা বিচারে আটক করার বিরুদ্ধে যে নাগরিক অধিকার ১৬২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা আজ একাধিক দেশে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বাক্-স্বাধীনতা হরণের জন্যে আজ দেশে দেশে আইন তৈরি হচ্ছে। ব্রিটেনে 'পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট' পাশ করে পুলিসকে যে-কোনো সভা বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকলের সমান অধিকার সংবিধানে
স্বীকৃত হলেও কার্যক্ষেত্রে আজ তা পদদলিত।

স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়েছিলো, "ভগবান সবাইকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন এবং সমান অধিকার দিয়েছেন।" আমেরিকার গঠনতন্ত্র শুরু করাই হয়েছিলো এই বলে যে, "সবাই যাতে ন্যায় বিচার পেতে ও স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে পারে তার জন্যে আমরা আমেরিকার জনসাধারণ এই গঠনতন্ত্র রচনা করছি।" কিন্তু সমান অধিকার ও ন্যায়বিচারের বদলে সেখানে দেখছি

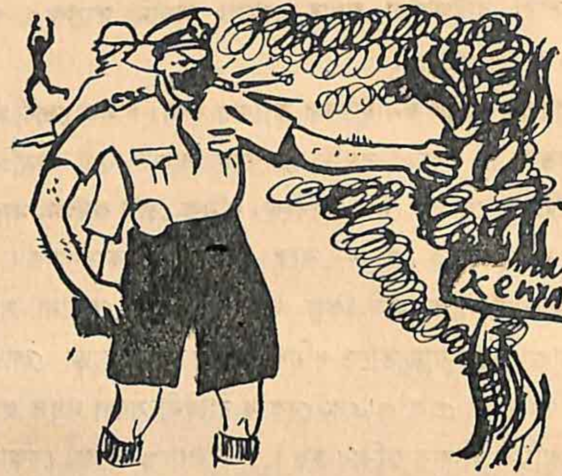
নিগ্রোদের প্রতি ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার। স্বাধীনভাবে মত পোষণ ও মত প্রকাশ করার অধিকার সেখানে লোপ পেয়েছে। তাই দেখি চার্লি চ্যাপলিনের মতো শিল্পী বা থিওডর ড্রেইসারের মতো সাহিত্যিক বা ওপেনহাইমারের মতো বৈজ্ঞানিক সেদেশে প্রতিদিন লাঞ্ছিত হচ্ছেন। শাসকশ্রেণীর পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে এরকম সব বই প্রকাশ্যে ঘটা করে পোড়ানো হচ্ছে। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের অনেক মূল্যবান সম্পদ এই আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে। একের পর এক আইন করে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হবার অধিকার সেখানে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

ভিড়ের রেলগাড়িতে কামরার ভেতরের ও বাইরের যাত্রীদের ঝগড়া তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছো। কোনো নতুন যাত্রী কামরায় ঢুকতে এলে ভেতরে যারা আছে তারা প্রাণপণে বাধা দেয়, বলে—এখানে জায়গা হবে না, অন্য কোথাও দেখুন। আর বাইরের যাত্রী তখন চীৎকার করে বলে—'আলবত ঢুকবো, গাড়ি কি আপনার রিজার্ভ করা মশাই!' তারপর বাইরের যাত্রীটি যদি কোনো প্রকারে কামরার ভেতরে ঢুকতে পারলো তো অমনি তার সুরও বদলে গেলো। সে তখন ভেতরের যাত্রীদের সঙ্গে মিলে বাইরের অন্যান্য যাত্রীদের ধমকাবে—'এখানে হবে না বলছি মশাই, শুনতে পাচ্ছেন না?' জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কে ধনিক শ্রেণীর মনোভাবটাও কতোকটা এরকম। সামন্তপ্রভুরা যখন তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে ঠেলে রেখেছিলো তখন তারা কামরার বাইরের যাত্রীদের মতোই সকলের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করতো। কিন্তু

যেই তারা রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেলো অমনি তাদেরও সুর ও আচরণ বদলে গেলো।

তারপর রাষ্ট্রের জনহিতকর কাজের কথা। ধনিক শ্রেণী সমাজে শ্রেণীবিভাগ ও শোষণ বজায় রেখেছে বলেই এই জনহিতকর কাজগুলির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ধনিক শ্রেণী কর্মক্ষম মানুষকে বেকার করে, তাকে শোষণ করে রোগজর্জর করে দেয়। এই দুঃস্থ মানুষগুলিকে যদি কিছু ভাতা বা অন্য কোনো সাহায্য দিয়ে ঠাণ্ডা রাখা যায় তাতে ধনিক শ্রেণীর লাভ ছাড়া লোকসান নেই। তা ছাড়া প্রকাণ্ড এক বেকার বাহিনী সর্বদা মজুদ থাকলে সস্তায় শ্রমিক পাবার সুবিধে হয়। ইংল্যাণ্ডে দুঃস্থ বেকারদের সাহায্যের আইন্ এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ধনিক শ্রেণীর মুনাফা বাড়াবার প্রয়োজন যখন হয় তখন দুঃস্থদের এই খুদ-কুড়োতেই প্রথম হাত পড়ে। যেমন, ১৯৫৩-৫৪ সালে ব্রিটেনে ধনিক শ্রেণীর মুনাফা বাড়াবার প্রয়োজনে জনহিতকর কাজের ব্যয়-বরাদ্দ ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়ে দেওয়া হলো। আর তা ছাড়া, এই দুঃস্থরা যদি কখনও ধনিক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তা হলে 'কল্যাণকর' রাষ্ট্রের হাতে বেকার ভাতার টাকার বদলে দেখা দেয় পুলিসের লাঠি আর বন্দুক।

সুতরাং কিছু জনহিতকর কাজ বা সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতার অল্পবিস্তর স্বীকৃতি দ্বারা রাষ্ট্রের মূল চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। যে আগুনে ঘর পোড়ে সেই আগুন আলোও দেয়, উত্তাপও দেয়। কিন্তু তাই বলে ঘরের আগুনকে কেউ শান্তিদীপ বলবে না। তাই এসব কিছু সত্ত্বেও বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধনিক



উপনিবেশে গণতন্ত্রের বহ্নি-উৎসব।

শ্রেণীর শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার পীড়ন-যন্ত্রই থেকে যাচ্ছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শ্রেণীচরিত্রের আর একটা বড়ো পরিচয় উপনিবেশগুলির প্রতি তাদের আচরণ।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজয়ী ধনিক গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র ছিলো আত্মশাসনের অধিকার। এই নীতি অনুসারেই প্রতিটি জাতির স্বাধীনতার অধিকার অনস্বীকার্য।

কিন্তু আজ আমরা দেখছি গণতন্ত্রের জন্মভূমি বলে গর্ব করে যে ব্রিটেন, সে ৪০টি দেশকে এখনও পদানত করে রেখেছে। 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার' দেশ বলে পরিচিত ফ্রান্স পন্দিচেরির মতো একটুকরো জমি দখলে রাখার জন্যে কতো ভারতীয়কেই না হত্যা করলো!

পরাধীন জাতির স্বাধীনতার প্রশ্নে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান গণতন্ত্র সকল মানুষের গণতন্ত্র নয়। এই গণতন্ত্র ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্র। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্বদেশের সাধারণ মানুষ এবং উপনিবেশের সকল মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণীর শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার পীড়ন-যন্ত্র মাত্র।



লোকটা ভোট দিতে এসেছিলো মানুষকে। কিন্তু এসে দেখে, ভোটের আসরে নেমেছে হাতি আর গাধা। লোকটি বুঝতে পারছে না কী করবে! 'হাতি' আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টির আর 'গাধা' ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিক।

সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র

এতোক্ষণ আমরা ধনিক গণতন্ত্রের কথা আলোচনা করলাম। কিন্তু যেখানে সমাজে ধনিক শ্রেণীর আধিপত্য শেষ হয়ে গিয়েছে, সেখানে নতুন এক ধরনের গণতন্ত্র জন্ম নিয়েছে। এর নাম সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের দেশ সোবিয়েত ইউনিয়নে এই গণতন্ত্র প্রচলিত বলে একে সোবিয়েত গণতন্ত্রও বলা হয়।

এই গণতন্ত্রের সঙ্গে ধনিক গণতন্ত্রের তফাত কোথায়?

আমরা আগেই দেখেছি, ধনিক সমাজের গণতন্ত্রে জনসাধারণের অধিকার কতো সীমাবদ্ধ, কতো অবাস্তব। সেখানে সমাজের ধনদৌলত উৎপাদনের যতো কিছু উপায় সব ধনিক শ্রেণীর হাতের মুঠোয়। এই একচেটিয়া মালিকানার জোরে ধনিক শ্রেণী সেখানে রাষ্ট্রের ওপর একচ্ছত্র দখল কায়েম করে রেখেছে। উৎপাদনের উপায়গুলির ওপরে ধনিক শ্রেণীর একচেটিয়া মালিকানা ভেঙে দিয়ে সমাজতন্ত্র উৎপাদনের উপায়গুলিকে সমাজের সকলের সম্পত্তিতে পরিণত করে। ফলে রাষ্ট্রের ওপর ধনিক শ্রেণীর একচ্ছত্র দখলও ভেঙে যায়। রাষ্ট্রকে ধনিক শ্রেণী তখন আর নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করতে পারে না। গণতন্ত্র তখন ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্র না হয়ে প্রকৃত গণতন্ত্র হয়ে ওঠে। ধনিক সমাজের গণতন্ত্রে জনসাধারণের প্রকৃত অধিকার কতোখানি? ধনিক শ্রেণীর কোন্ প্রতিনিধিরা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত তাদের শাসন করবে ধনিক গণতন্ত্রে জনসাধারণ ভোট দিয়ে শুধু তাই ঠিক করার অধিকারী। এর বেশি কোনো অধিকার তাদের

নেই। আর সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রে জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদের শাসন করে।

এই পার্থক্যটা ভালো করে বুঝতে হলে ধনিক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রের রাষ্ট্রকাঠামোর পার্থক্যটা বোঝা দরকার।

ধনিক গণতন্ত্রে আমলারাই শেষ পর্যন্ত দেশের আসল শাসক হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশের একটা জেলার কথাই ধরা যাক। ধরো, বর্ধমান জেলা। সেখানে শাসনকার্য চলে কীভাবে? বর্ধমানে শাসনকার্য চালাবার জন্যে কোন খাতে কতো ব্যয় হবে তা ঠিক করবে কে? বর্ধমানের লোকেরা? না। সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা স্থির করবে কে? বর্ধমানের লোকেরা? না। সেখানে জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্যে কী কী করা প্রয়োজন তা ঠিক করবে কে? স্থানীয় লোকেরা? না। এ-সব ব্যাপারে বর্ধমানের লোকদের কোনোই হাত নেই। এ সবকিছুর মালিক হচ্ছে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। বর্ধমানের লোকেরা কিন্তু তাকে নির্বাচিত করবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হবে ওপর থেকে মন্ত্রিসভার দ্বারা। কেন্দ্রীয় সংসদ ও রাজ্যবিধানমণ্ডল যে আইন পাশ করবে এবং ওপরওয়ালারা যে হুকুম দেবে নিজের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে সেই অনুসারেই ম্যাজিষ্ট্রেট জেলার শাসনকার্য চালাবে।

সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রে ব্যবস্থাটা হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেখানে বর্ধমানের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ভোটে একটি সোবিয়েত বা প্রতিনিধি-পরিষদ নির্বাচিত হবে এবং এই নির্বাচিত সোবিয়েতের হাতেই থাকবে জেলার সমস্ত শাসনভার। জেলার শাসন-

কার্য চালাবার জন্যে কোন খাতে কতো ব্যয় হবে, জেলার শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের আইনগুলি জেলায় কার্যকরী করা হবে কী উপায়ে, জেলার বাসিন্দাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্যে কী কী করা প্রয়োজন, জেলার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্যে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার—এ সবকিছুই নির্বাচিত সোবিয়েত ঠিক করবে। দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্যে সোবিয়েত কিছু কর্মচারীও নির্বাচিত করবে। ধনিক গণতন্ত্রে আমলাদের ওপর নির্বাচিত পরিষদগুলির বিশেষ কোনো কর্তৃত্ব সেই। কিন্তু সোবিয়েত গণতন্ত্রে এই কর্মচারীরা তাদের কাজকর্মের জন্যে সোবিয়েতের কাছে দায়ী থাকবে। প্রয়োজন হলে সোবিয়েত যে-কোনো কর্মচারীকে সরিয়ে দিতেও পারবে।

সমাজতন্ত্রী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুধু জেলাতেই নয়, প্রতিটি গ্রামে পর্যন্ত এমনিভাবে সকলের ভোটে সোবিয়েত নির্বাচিত হবে এবং এই নির্বাচিত সোবিয়েতগুলি নিজ নিজ অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

এই হলো দুই ব্যবস্থার সর্বপ্রথম পার্থক্য। ধনিক গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ ভোট দিয়েই খালাস, নিজের ভাগ্যনির্ধারণে তার হাত থাকে খুবই সামান্য। সেখানে রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করে আমলারা, যে আমলাদের ওপরে ভোটারদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। আর সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রে ক্ষুদ্রতম গ্রামের অধিবাসীরা পর্যন্ত নিজেদের অঞ্চলের শাসনকার্য নিজেরাই পরিচালনা করে, সেখানে আমলারা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত, জনসাধারণের কাছে দায়ী।

এক যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকল জাতির সমান অধিকার হচ্ছে সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। ধনিক সমাজে যে-সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক জাতির বাস, সেখানে সকল জাতির সমান অধিকার কখনোই স্বীকৃত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্ত্র বা অর্থের জোরে এই সব রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮৪৫ সালে অস্ত্রের জোরে মেক্সিকোর কাছ থেকে টেক্সাস, উটা, আরিজোনা, নিউ মেক্সিকো ও কালিফোর্নিয়া রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, স্পেন ও ফ্রান্সকে ফ্লোরিডা ও লুসিয়ানা রাজ্য বিক্রি করে দিতে বাধ্য করেছে, আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে তাদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছে, তাদের পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই ভাবে স্থাপিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

কিন্তু সোবিয়েত সমাজতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের জন্যে পররাজ্য গ্রাসের প্রয়োজন হয়নি। বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে গঠিত ১৬টি স্বতন্ত্র রাজ্য সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছায় মিলিত হয়েছে। এই ১৬টি রাজ্যের প্রত্যেকের নিজ নিজ সংবিধান আছে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা পার্লামেণ্ট আছে, আলাদা সৈন্যবাহিনী আছে, কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে পৃথকভাবে চুক্তি করার অধিকার আছে এবং সর্বোপরি, এরা ইচ্ছে করলে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথকভাবেও থাকতে পারে। একবার ভেবে দেখো, কালিফোর্নিয়া বা নিউ মেক্সিকোর লোকেরা যদি বলে : আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকবো না, আমাদের আদি দেশ মেক্সিকোর সঙ্গে থাকবো, তাহলে কী কাণ্ডটাই না হবে! অথবা ভেবে দেখো,

পশ্চিম বাঙলার লোকেরা যদি বলে : আমরা আমাদের জন্যে আলাদা সংবিধান করতে চাই, আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্যে আমরা সরাসরি অন্য দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে চাই, তাহলে তার ফলটা কী দাঁড়াবে!

একভাষাভাষীদের নিয়ে একটি রাজ্য গঠন করার অতি মামুলি নীতি আমাদের দেশে এখনও স্বীকৃত হলো না। কিন্তু সোবিয়েত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি রাজ্য ভাষার ভিত্তিতে গঠিত।

ধনিক গণতন্ত্রে ধনিক শ্রেণীর শোষণে পশ্চাৎপদ জাতিগুলির অস্তিত্ব আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানদের মতোই পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় মুছে যাচ্ছে। কিন্তু সোবিয়েত গণতন্ত্রে ক্ষুদ্রতম জাতিরও অধিকার সুরক্ষিত। একটা উদাহরণ ধরা যাক। সাইবেরিয়ার উত্তরে বরফের রাজ্যে বাস করে 'নেনেটস্' জাতি। জারের আমলে শাসকশ্রেণীর শোষণে এদের অস্তিত্ব প্রায় মুছে যাবার উপক্রম হয়। ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে এদের জনসংখ্যা ১৬ হাজার থেকে কমে দু-হাজারে এসে দাঁড়ায়। সরকারী রিপোর্টে তখন বলা হয়েছিলো, আর কয়েক বছরের মধ্যেই এদের অস্তিত্ব লোপ পাবে। তারপর ১৯৩০ সালে সোবিয়েত সরকারের চেষ্টায় এদের জন্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হলো। আজ এই মৃতপ্রায় জাতি আবার বেঁচে উঠেছে। সেখানে শিল্প গড়ে উঠেছে, স্কুল-হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে, স্থানীয় ভাষায় বই ছাপা হচ্ছে, জনসংখ্যা ন বছরের মধ্যে দশ হাজার বেড়ে গেছে।

ধনিক গণতন্ত্র মুখে বলে : ভগবান সবাইকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন এবং সমান অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা দুর্বল জাতিগুলির ওপর অত্যাচার করে। আর সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র ভগবানের দোহাই না দিয়েও সকল জাতির সমান অধিকারের নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। এই দুই গণতন্ত্রের মধ্যে এই হলো দ্বিতীয় পার্থক্য।

সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তার ভোট-প্রথা। ধনিক গণতন্ত্রে কেউ একবার ভোটে নির্বাচিত হলে তার ওপর ভোটদাতাদের আর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না, পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সে ভোটারদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

কিন্তু সোবিয়েত গণতন্ত্রে ব্যবস্থাটা অন্যরকম। সেখানে ভোটাররা প্রার্থীদের পরিষদে গিয়ে কী কী করতে হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দেয়। সেই নির্দেশ কীভাবে এবং কতোখানি পালন করা হচ্ছে ভোটারদের কাছে সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইনত বাধ্য। কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি ভোটারদের নির্দেশ পালন না করে তাহলে ভোটাররা সেই প্রতিনিধির নির্বাচন বাতিল করে দিয়ে নতুন কাউকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাতে পারে। ভোটারদের এই অধিকার না থাকার দরুন ধনিক গণতন্ত্রে নির্বাচনটা হয়ে দাঁড়ায় প্রহসন, আর এই অধিকার আছে বলেই সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রে জনসাধারণ নির্বাচন মারফত রাষ্ট্রের ওপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

ধনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রের আর একটি বড়ো

পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এখানে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী পরিষদগুলির প্রত্যেকটিই সরাসরি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়। ধনিক গণতন্ত্রে উচ্চ পরিষদগুলি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয় না। আমাদের দেশে রাজ্যপরিষদ (Council of States) গঠিত হয় রাজ্যবিধান সভার দ্বারা নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতি-মনোনীত সদস্যদের নিয়ে। ইংল্যাণ্ডে অভিজাত বংশের লোকেরা বংশ-পরম্পরায় হাউস অব লর্ডসের সদস্য হন। এ ছাড়া রাজাও কিছু-সংখ্যক সদস্য মনোনীত করে। এই উচ্চ পরিষদের সম্মতি না পেলে নিম্ন পরিষদের কোনো আইনই পাশ হবে না। সমস্ত রকম আঁটঘাট বেঁধে রাখা সত্ত্বেও জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত নিম্ন পরিষদগুলি যদি কখনও ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ-বিরোধী কোনো আইন পাশ করে ফেলে তবে সেই আইন যাতে নাকচ হয় তাই বিশ্বস্ত লোকদের নিয়ে এই উচ্চ পরিষদগুলি গঠন করা হয়। সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রে পরোক্ষ ভোটে বা মনোনয়ন দ্বারা গঠিত এরকম কোনো উচ্চ পরিষদই নেই। কারণ সেখানে রাষ্ট্রকে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করতে হয় না। সোবিয়েত ইউনিয়নে কেন্দ্রে দুটি পরিষদ আছে। কিন্তু এই দুটিই সরাসরি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত এবং উভয়েরই সমান ক্ষমতা। এই দুটির একটি : সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের ভোটে নির্বাচিত ইউনিয়ন সোবিয়েত। আর একটি : সোবিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত জাতিসমূহের সোবিয়েত।

সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, তার বিচার-প্রথা।

ধনিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি বা রাজা জজদের নিয়োগ করে। এই নিয়োগে জনসাধারণের, এমনকি জনসাধারণের নির্বাচিত পরিষদগুলিরও, কোনো হাত নেই। আমাদের দেশেও এই একই নিয়ম। এখানে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের এবং রাজ্যপাল জেলা জজদের নিয়োগ করেন এবং একমাত্র তাঁরাই এদের পদচ্যুত করতে পারেন।

কিন্তু সোবিয়েত গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি জজ ভোটে নির্বাচিত হয় এবং ভোট দিয়ে তাদের আবার পদচ্যুতও করা যায়।

ধনিক গণতন্ত্রে যে কোনো নাগরিক জজ হতে পারে না। কিন্তু সোবিয়েত গণতন্ত্রে যে কোনো নাগরিক জজ নির্বাচিত হতে পারে।

ধনিক গণতন্ত্রে জুরির বিচার সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। আর যেখানে জুরির বিচার হয় সেখানেও জুরি নির্বাচিত হয় না। কিন্তু সোবিয়েত গণতন্ত্রে জুরি ছাড়া বিচার হয় না। এই জুরিরা ভোটে নির্বাচিত হয় এবং বিচারকালে এদের ক্ষমতা জজদের সমান।

রাষ্ট্রের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় জজদের ক্ষমতা অসীম। এই ক্ষমতা যাতে ধনিক শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ-রক্ষায় ব্যবহৃত হয় সেই জন্যেই ধনিক গণতন্ত্রে বিচারবিভাগের গঠন ও পরিচালনা এতো অগণতান্ত্রিক। সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রে কোনো কায়েমী স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন হয় না বলে সেখানে বিচারপদ্ধতিও গণতান্ত্রিক।

সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে রাষ্ট্র নাগরিকদের এমন কতোগুলি অধিকার মেনে নিয়েছে

যা না থাকলে সকলের সমান অধিকারের গণতান্ত্রিক নীতি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

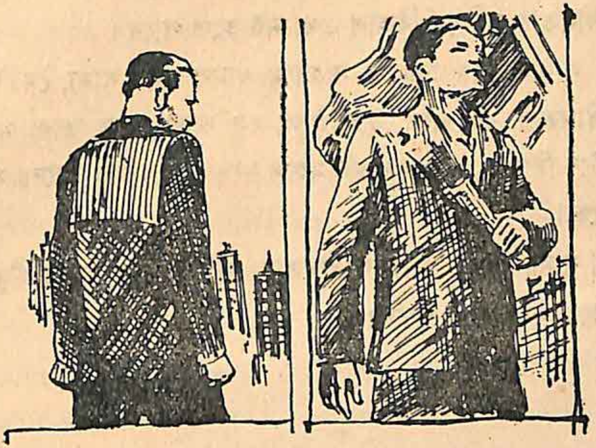
ধনিক গণতন্ত্রেও আইনে সকলের সকলের সমান অধিকার আছে। একজন গরিব যদি সেখানে মন্ত্রী হতে চায় তবে আইন তাকে বাধা দেবে না। কিন্তু ধনিক গণতন্ত্রে এই অধিকার কতোখানি খাঁটি?

ধনিক গণতন্ত্রে সকলের সমান অধিকার কাগজে-কলমে থাকলেও কার্যত নেই, কারণ সেখানে সমান সুযোগের অভাব। একজন গরিবের মন্ত্রী হবার পথে সেখানে আইনের কোনো বাধা না থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কারণ, ধনিক গণতন্ত্রে মন্ত্রী হতে হলে ভোট প্রভৃতির জন্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় সেই অর্থ গরিবলোকটির নেই। একজন পাঁচ বছরের শিশু আর একজন কুড়ি বছরের জোয়ানকে যদি তুমি বলো : ঐ আম গাছে উঠে পাকা আম খাবার সমান অধিকার তোমাদের দুজনকেই দিলাম, তাহলে কথাটা কি নেহাত ঠাট্টার মতো শোনাবে না? তুমি জানো ঐ দুজনকে সমান অধিকার দিলেও শিশুটি গাছে উঠতে পারবে না, উঠবে ঐ জোয়ান ছেলেটি এবং আমগুলি সে একাই খাবে। সুতরাং ঐ দুজনকে আম খাবার সমান অধিকার যদি সত্যিই দিতে হয় তবে শিশুটির হাতের কাছে আম এনে দিতে হবে। তা না হলে দুজনের সমান অধিকার আসলে একজনের অধিকার হয়ে দাঁড়াবে।

ধনিক সমাজে হচ্ছেও তাই—এখানে যেহেতু সকলের সমান সুযোগ নেই, সেইহেতু সকলের সমান অধিকারের নীতি কার্যক্ষেত্রে

যাদের সুযোগ আছে সেই ধনিক শ্রেণীর অধিকারে পরিণত হচ্ছে।

সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র এই অবস্থাটা বদলে দিচ্ছে। এখানে রাষ্ট্র সবাইকে সমান অধিকার ভোগের সুযোগ করে দিচ্ছে।



দুই গণতন্ত্রে নাগরিকের অধিকার : ধনিক গণতন্ত্রে নাগরিক আইনত কাজ পাবার অধিকারী নয়। সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র নাগরিকের কাজ পাবার ও করার অধিকার সুরক্ষিত করেছে।

সকলের কাজ পাবার সমান অধিকার যাতে কথার কথা হয়ে না দাঁড়ায় সেই জন্যে সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেকেই যাতে কাজ পায় তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে।

সকলের শিক্ষার সমান অধিকার যাতে প্রহসনে পরিণত না হয় তার জন্যে সোবিয়েত রাষ্ট্র বিনা পয়সায় সাত বছর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করছে। নামমাত্র খরচায় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিনা খরচায় যাতে সবাই উচ্চশিক্ষা পেতে পারে সে ব্যবস্থাও সোবিয়েত রাষ্ট্র করেছে।

এমনিধারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সোবিয়েত গণতন্ত্র তার নাগরিকদের বড়ো হবার সমান সুযোগ করে দিয়েছে। তাই সকলের সমান অধিকার ভোগ এখানেই সম্ভব। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপূর্ণ বিকাশ এখানেই হতে পারে।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধনিক শ্রেণী সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার যে ধ্বজা তুলেছিলো সে ধ্বজা আজ তারা মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে। কারণ এই মহান মন্ত্রের প্রয়োজন তাদের ফুরিয়ে গেছে।

সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার সেই পতাকা আজ উঁচু করে ধরেছে সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র।

এর পরে আমরা সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোর কয়েকটি নকশা দিলাম।

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শাসনকার্য কীভাবে চলে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পেতে হলে গোড়াতেই কয়েকটি কথা জেনে নেওয়া দরকার।

পৃথিবীর ছ ভাগের এক ভাগ জুড়ে সোবিয়েত দেশ। দেশের এক প্রান্ত ইউরোপে, আরেক প্রান্ত এশিয়ায়।

ইউরোপ-এশিয়া-জোড়া এই বিশাল রাষ্ট্রে অনেক জাতি ও অধি-জাতি থাকে। সংখ্যায় তারা ষাটের কম নয়। জনসংখ্যার হিসেবে সবচেয়ে বড়ো জাতি রুশ। রুশ জাতি ছাড়া ইউক্রেনিয়ান, উজবেক, কাজাক, জর্জিয়ান প্রভৃতি ছোটো বড়ো আরো বহু জাতি সোবিয়েত দেশে থাকে।

আমাদের ভারত-রাষ্ট্রে বাঙলা, বিহার, আসাম প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য আছে। সোবিয়েত রাষ্ট্রে ১৬টি ইউনিয়ন রিপাবলিক আছে ; বড়ো বড়ো এক-একটি জাতির বাসভূমি নিয়ে এক-একটি ইউনিয়ন রিপাবলিক তৈরি হয়েছে।

কোনো কোনো ইউনিয়ন রিপাবলিকে প্রধান জাতিটি ছাড়াও জনসংখ্যার হিসেবে ছোটো ছোটো অধি-জাতি (ন্যাশনালিটি) আছে। সেই সব ছোটো ছোটো অধিজাতিদের নিয়ে ইউনিয়ন রিপাবলিকের মধ্যেই তৈরি হয়েছে স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক। যেমন, রুশ ইউনিয়ন রিপাবলিকের মধ্যে আছে তাতার, বশকির, দাগেস্তান, কোমি, মারি, ইয়াকুত প্রভৃতি ১২টি অধি-জাতি বা ন্যাশন্যালিটি। এই প্রত্যেকটি অধি-জাতি নিয়ে এক-একটি

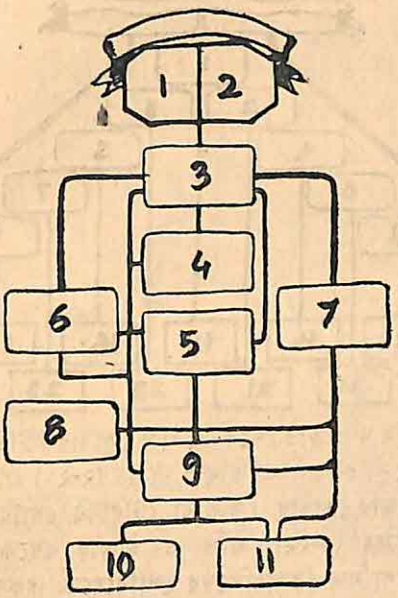
স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক তৈরি হয়েছে।

ইউনিয়ন রিপাবলিকের মধ্যে আবার আরো ছোটো ছোটো জনসমষ্টি আছে। তারা জনসংখ্যায় খুবই ছোটো। কিন্তু তবু তো তারা আলাদা একটা জনসমষ্টি। তারা ইউনিয়ন রিপাবলি-কের মধ্যেই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (রিজিয়ন) হিসেবে থাকে। এইভাবেই, সংখ্যায় যারা একেবারে নিতান্তই ছোটো তারা থাকে তাদের জাতীয় এলাকায় (ন্যাশনাল এরিয়ায়)।

অর্থাৎ, ইউনিয়ন রিপাবলিকের মধ্যেই তিন ধরনের ভাগ থাকতে পারে: এক, স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক ; দুই, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ; তিন, জাতীয় এলাকা।

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি ইউনিয়ন রিপাবলিকের প্রত্যেক-টিই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

॥ সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রক্ষমতার বণ্টন ॥

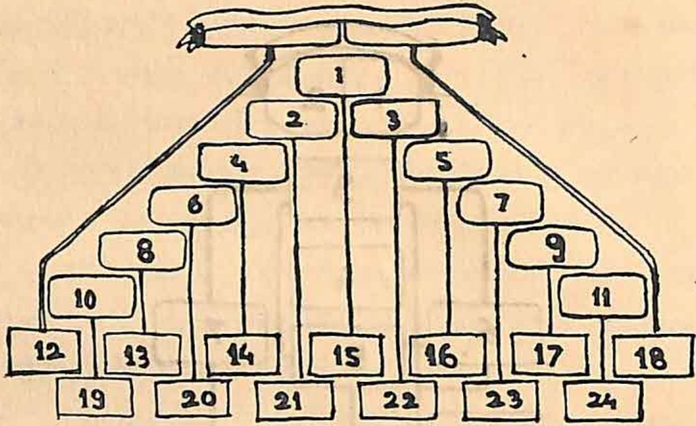


সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম (সর্বোচ্চ) সোবিয়েতই হলো দেশের উচ্চতম রাষ্ট্রযন্ত্র। সুপ্রীম সোবিয়েতের দুটি সদন : (১) ইউনিয়নের সোবিয়েত (২) জাতিসমূহের সোবিয়েত (৩) ইউনিয়ন রিপাবলিকের সর্বোচ্চ সোবিয়েত (৪) স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিকের সর্বোচ্চ সোবিয়েত (৫) স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সোবিয়েত (৬) ক্ষেত্র বা টেরিটরি-র সোবিয়েত (৭) আঞ্চলিক সোবিয়েত (৮) জাতীয় এলাকার সোবিয়েত (৯) জেলা সোবিয়েত (১০) গ্রাম সোবিয়েত (১১) শহর সোবিয়েত

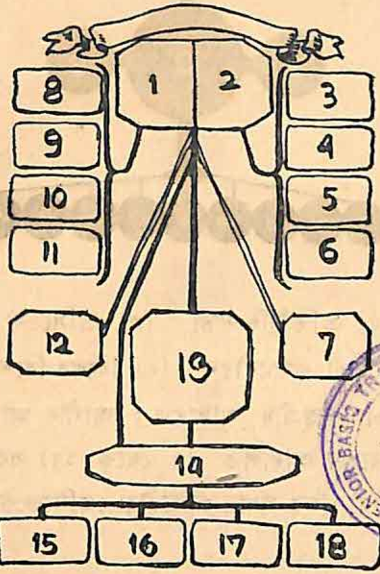
॥ সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রথা ॥

=সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোবিয়েত=

ইউনিয়নের সোবিয়েত ॥ জাতিসমূহের সোবিয়েত

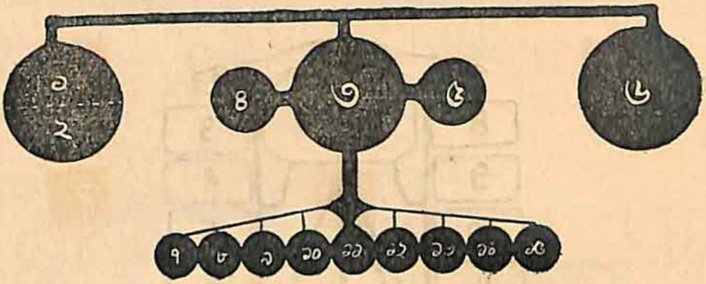


(১ ও ১৫) প্রতি ৫ হাজার থেকে ১২ লক্ষ ভোটার ইউনিয়ন রিপাবলিকের সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি পাঠায় (২-২১) প্রতি ১১ হাজার থেকে ১৫ হাজার ভোটার ক্ষেত্র বা টেরিটরি সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি পাঠায় (৩-২২) প্রতি ৪ হাজার থেকে ২০ হাজার ভোটার স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিকের সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি পাঠায় (৪-১৪) প্রতি ৮ হাজার থেকে ৩০ হাজার ভোটার আঞ্চলিক সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি পাঠায় (৫-১৬) প্রতি দেড় হাজার থেকে ৩ হাজার ভোটার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি পাঠায় (৬-২০) প্রতি ৫ হাজার থেকে ৯ হাজার ভোটার এলাকা সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি পাঠায় (৭-২৩) প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জাতীয় এলাকার সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি (৮-১৩) প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে শহরের জেলা সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি (৯-১৭) প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জেলা সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি (১০-১৯) ৩৫০ থেকে তিন হাজার ভোটার শহর সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি পাঠায় (১১-২৪) প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে গ্রাম সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি (১২) প্রতি তিন লক্ষ ভোটার ইউনিয়ন রিপাবলিক সোবিয়েতে একজন প্রতিনিধি পাঠায় (১৮) জাতিসমূহের সোবিয়েত : প্রত্যেক জাতীয় এলাকা থেকে ১ জন, প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল থেকে ৫ জন ; প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক থেকে ১১ জন ; প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিক থেকে ২৫ জন ।



(১) ইউনিয়ন সোবিয়েত : তার একজন চেয়ারম্যান, দুজন ভাইস-চেয়ারম্যান (২) জাতিসমূহের সোবিয়েত : একজন চেয়ারম্যান, দুজন ভাইস-চেয়ারম্যান ॥ (৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১) দুই সদনের অধীন বিভিন্ন বিষয়ের জন্যে বিভিন্ন কমিটি ॥ (১২) সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত—দুই সদনের দ্বারা নির্বাচিত ॥ (৭) সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকিউরেটর-জেনারেল, অর্থাৎ প্রধান সরকারী উকিল (নিযুক্ত) ॥ (১৩) সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিমণ্ডলী—১ জন সভাপতি, ১৬ জন সহ-সভাপতি ১৫ জন সভ্য, একজন সেক্রেটারি (নির্বাচিত) (১৪) মন্ত্রিসভা (নিযুক্ত) (১৫) যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিদপ্তর (১৬) ইউনিয়ন রিপাবলিকের মন্ত্রিদপ্তর (১৭) যুক্তরাষ্ট্রের নানান বিভাগ (১৮) ইউনিয়ন রিপাবলিকের নানান বিভাগ

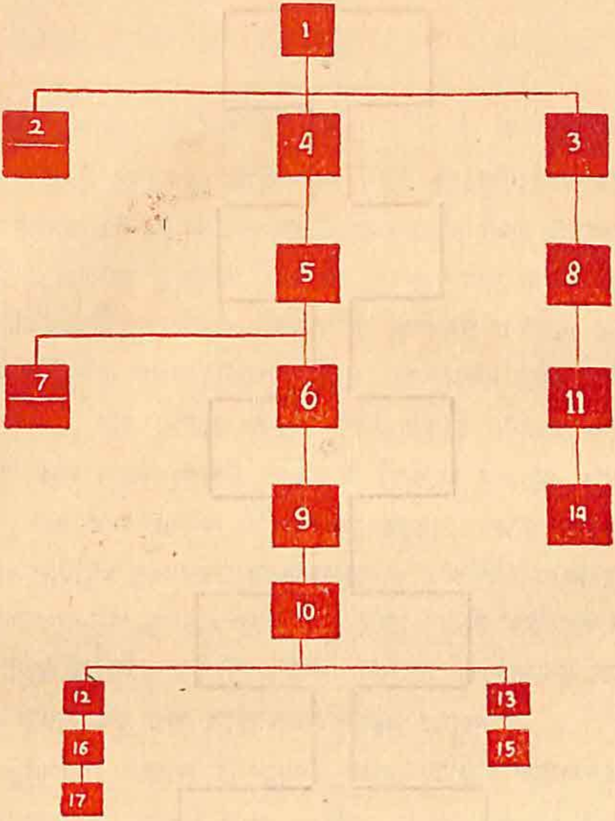
॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-কাঠামো ॥



(১) সিনেট (২) প্রতিনিধি-সভা (৩) প্রেসিডেন্ট (৪) প্রেসিডেন্টের সহায়ক স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ (৫) বিশেষ বিশেষ জরুরী শাখা (৬) বিচার বিভাগ—সুপ্রীম আদালত; আপীল আদালত; জিলা আদালত ও বিশেষ আদালত (৭ থেকে ১৫) সরকারের বিভিন্ন শাখা। এই শাখাগুলির প্রধান কর্মচারীরা প্রেসিডেন্টের মন্ত্রণা-সভার সভ্য :

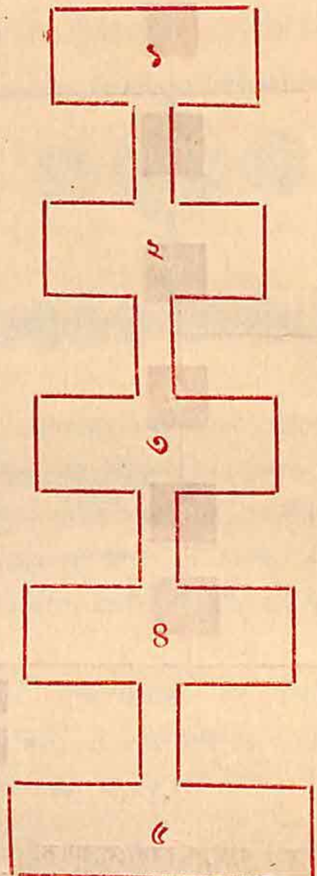
৭। রাজ্য ৮। খাজাঞ্চিখানা ৯। সামরিক ১০। বিচার ১১। পোষ্ট অফিস ১২। আভ্যন্তরিক ১৩। কৃষি ১৪। ব্যবসা-বাণিজ্য ১৫। শ্রম বিভাগ।

॥ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামো ॥



১] রাষ্ট্রপতি ২] সংসদ : রাজ্যপরিষদ/লোকসভা ৩] সুপ্রীম কোর্ট ৪] কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৫] রাজ্যপাল/রাজপ্রমুখ ৬] রাজ্য-মন্ত্রিসভা ৭] রাজ্যবিধানমণ্ডল : বিধানপরিষদ/বিধানসভা ৮] রাজ্য-হাইকোর্ট ৯] বিভাগ (কমিশনার-শাসিত) ১০] জেলা (ম্যাজিস্ট্রেট-শাসিত) ১১] জেলা জজ ১২] জেলার পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট ১৩] মহকুমা (মহকুমা হাকিম-শাসিত) ১৪] মহকুমা মুন্সেফ ১৫] ডেপুটি, সাব-ডেপুটি, সার্কেল অফিসার প্রভৃতি ১৬] অতিরিক্ত পুলিস সুপারিনটেন-ডেন্ট, সার্কেল ইন্সপেক্টর প্রভৃতি ১৭] থানা (দারোগা)।

॥ পুঁজিবাদী উৎপাদনের ধারা ॥



[১] টাকা— তোমার হাতে টাকা আছে, তাই দিয়ে কারখানা ফাঁদতে চাও। কী করবে? [২] টাকা দিয়ে তুমি জমি কিনবে, কারখানার দালান তুলবে, মেশিন কিনে বসাবে, গুদামে কাঁচামাল কয়লা জড়ো করবে, মজুরি দিয়ে শ্রমিকের মেহনত কিনবে [৩] মজুর মেশিন চালিয়ে কাঁচামাল থেকে নতুন মাল উৎপাদন করবে [৪] নতুন মাল তৈরি হলো ধরো,—তুলো থেকে কাপড়, পাট থেকে চট তৈরি হলো [৫] সেই নতুন মাল বেচে তুমি টাকা পেলে : ব্যবসায় যতো টাকা গোড়ায় ঢেলেছিলে তার চেয়েও বেশি টাকা পেলে; সেই বাড়তি টাকাটাই তোমার লাভ। এবার তুমি আবার [১]-এর অবস্থায় ফিরে যাবে। এইভাবে চক্রাকারে ঘুরে-ঘুরে পুঁজিবাদী উৎপাদন চলে।

পুঁজিবাদ

এতোক্ষণ আমরা পুঁজিবাদী (Capitalist) ও সমাজতন্ত্রী (Socialist) সমাজের রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা এই দুই সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথমে পুঁজিবাদ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জিনিসপত্র উৎপাদন বা তৈরি হতো প্রধানত স্থানীয় অভাব পূরণের জন্যে। কেনাবেচা হতো সেখানে খুবই কম। যদি কখনও কোনো কিছু বাড়তি মাল তৈরি হয়ে যেতো তবে সেটা দেশের অন্যত্র বা বিদেশে অন্যদের বাড়তি মালের সঙ্গে অদলবদল বা বিনিময় করা হতো। আর যদিও বা কখনও নিয়মিত কেনাবেচা হতো তাহলেও তার পরিমাণ সমাজের মোট উৎপাদনের তুলনায় খুবই কম ছিলো। এই ব্যবস্থাকে বলে স্বাভাবিক উৎপাদন-প্রণালী, কেননা এখানে উৎপাদনের কারণ হচ্ছে অভাব এবং লক্ষ্য হচ্ছে সরাসরি অভাব পূরণ।

পুঁজিবাদী সামাজ উৎপাদনটা আর সরাসরি অভাবপূরণের জন্যে হয় না। এখানে পণ্য (অর্থাৎ যে-সব দরকারী জিনিস বাজারে কিনতে পাওয়া যায়) উৎপাদন হয় সরাসরি অভাব পূরণের জন্যে নয়,—বিক্রি করে লাভ করার জন্যে। আগেকার সমস্ত যুগে যতোটুকু বিনিময় হতো তা হতো এক পণ্য দিয়ে অন্য পণ্য পাবার জন্যে, লাভের আশায় নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী যুগে বিনিময়ের উদ্দেশ্য বদলে গেলো। আগে পণ্য বেচে লোকে টাকা পেতো। এবং সেই টাকা দিয়ে যে-সব পণ্যের অভাব ছিলো

তাই কিনতো। এখন পুজিপতিরা টাকা দিয়ে পণ্য কেনে এবং পরে বেশি টাকায় সেই পণ্য বেচে দেয়। এই বাড়তি টাকাটা পাবার জন্যেই পঁুজিপতিরা কেনাবেচা করলো, পণ্য পাওয়া আর বিনিময়ের উদ্দেশ্য থাকলো না। বিনিময়ের উদ্দেশ্য দাঁড়ালো এখন বেশি টাকা, অর্থাৎ লাভ।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন ও বিনিময়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে লাভ বা মুনাফা করা। সমাজের কী প্রয়োজন, কখন কোন পণ্য মানুষের বেশি দরকার—এ সব কথা পুঁজিবাদীদের কাছে বড়ো কথা নয়। হয়তো এখন মানুষের কাপড়ের বড়ো দরকার। কিন্তু কাপড় উৎপাদনে যদি বেশি লাভ না হয় তা হলে পুজিবাদীরা কাপড় বেশি উৎপাদন করবে না, করবে অন্য কিছু যাতে তাদের লাভ বেশি। তাই সমাজের প্রয়োজন নয়, মুনাফাই হচ্ছে পুঁজিবাদের প্রধান লক্ষ্য ; মুনাফাই হচ্ছে তাদের প্রাণ।

কিন্তু মুনাফা করতে হলে দুটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথমত, উৎপাদন-যন্ত্রে (অর্থাৎ যা দিয়ে পণ্য উৎপাদন করা হয়, যেমন,—যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, জমি-জমা, খনি ইত্যাদিতে) ব্যক্তিগত মালিকানা। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, জমি, খনি ইত্যাদি যখন কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় কেবলমাত্র তখনই ঐ-সব যন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে সে মুনাফা করতে পারে। তাই পুঁজিবাদের প্রধান ভিত্তি হলো উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা।

কিন্তু উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলেই পণ্য উৎ-

পাদন হয় না। যন্ত্রগুলি চালালে তবে তো পণ্য উৎপাদন হবে। কিন্তু যন্ত্রগুলি চালাবে কে? ধরো, একটা মস্ত বড়ো কাপড়ের কল। মাত্র চার জন লোক তার মালিক। এই চার জন মালিক মিলে তো আর অতো বড়ো কলটা চালাতে পারবে না! তাই এই কল চালাবার জন্যে চাই এমন এক শ্রেণীর লোক যাদের না আছে জমি-জমা, না আছে টাকা-কড়ি। তারা একেবারে সর্বহারা। তাই শরীর খাটিয়ে বাঁচা ছাড়া তাদের বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। এদের বলে মজুর শ্রেণী। কারণ এরা মালিকের কাছ থেকে মজুরি নিয়ে মালিককে নিজেদের শ্রমশক্তি বা খাটবার শক্তি বিক্রি করে। উৎপাদন-যন্ত্র খাটিয়ে পণ্য উৎপাদন করে মুনাফা অর্জন করতে হলে পুঁজিপতিদের তাই প্রয়োজন মজুর শ্রেণীকে।

তাহলে পুঁজিবাদী সমাজের চরিত্রটা এবার আমরা মোটামুটি বুঝলাম। যে-সমাজে উৎপাদন-যন্ত্রগুলি ব্যক্তিগত দখলে থাকে, যেখানে মজুরির বিনিময়ে একশ্রেণীর লোক দেহের শ্রম দিয়ে এই যন্ত্রগুলি খাটিয়ে পণ্য উৎপাদন করে এবং যেখানে কেবলমাত্র লাভের জন্যে এই পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি হয়, সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে আমরা পুজিবাদী সমাজ বলবো।

॥ পুঁজি কী? ॥

পুঁজি কাকে বলে এখানে তা বলে রাখা দরকার। ব্যক্তিগত লাভের জন্যে পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রগুলি যখন ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে তখন তাকে বলে পুঁজি।

এবার প্রশ্ন উঠবে: এই উৎপাদন-যন্ত্রগুলি মালিকদের দখলে

এলো কী করে? প্রথম কারখানা খোলার জন্যে তারা পুঁজি পেলো কোথায়?

এর জবাবে কেউ কেউ বলেন, অনেকদিন ধরে আয় থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে জমা করে লোকে পুঁজি সঞ্চয় করেছিলো। কিন্তু সামন্তযুগে একমাত্র জমিদার ও রাজা ছাড়া আর সকলেরই আয় ছিলো খুবই সামান্য। সুতরাং সেই আয় থেকে বাঁচিয়ে পুঁজি সঞ্চয় করা অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। তবে পুঁজি এলো কোথা থেকে? এর জবাব ইতিপূর্বেই আমরা কিছুটা পেয়েছি তৃতীয় খণ্ডে।

এই প্রথম পুজির প্রায় সবটাই লুণ্ঠন, ডাকাতি ও নিষ্ঠুর শোষণের ফল। বণিক যুগে বণিক শ্রেণী স্বদেশে কুটির-শিল্পের কারিগর ও চাষীদের এবং উপনিবেশগুলির জনসাধারণকে লুণ্ঠন করে অগাধ ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছিলো। এদের লুণ্ঠনের অন্যতম সাক্ষী আমরা ভারতবাসীরা। ভারতে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লুণ্ঠনের কথা এখনও আমরা ভুলি নি। আমরা জানি কীভাবে এ-দেশে বিলাতি কাপড় চালাবার জন্যে তারা আমাদের তাঁতীদের আঙুল কেটে দিয়েছিলো। এদের লুণ্ঠনের ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ঢাকার জনসংখ্যা ১৮১৫ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে দেড় লক্ষ থেকে কমে ২০ হাজারে দাঁড়ায়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সাল—মাত্র এই ন বছরের মধ্যে এরা এক বাঙলা থেকেই ৬০ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা) ঘুষ আদায় করেছে।

এই লুণ্ঠন ছাড়াও এদের অর্থ সঞ্চয়ের আর একটা উপায়

ছিলো দাসব্যবসা। ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে লোক ধরে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করেছে। ইংরেজ ধনিক সমাজে বিখ্যাত বীর বলে সম্মানিত হকিন্স আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে আমেরিকায় চালান দিতো। সতেরো ও আঠারো শতাব্দীতে আমেরিকায় দাস চালান দেবার ব্যবসায় ব্রিটিশ ধনিকরাই সবচেয়ে অগ্রণী। ১৬৮০ থেকে ১৭৮৬ সালের মধ্যে তারা প্রতি বছর গড়ে বিশ হাজার করে দাস চালান দিয়েছে।

লুণ্ঠন, ডাকাতি ও দাসব্যবসার সাহায্যেই প্রধানত প্রথম পুঁজির সৃষ্টি হলো। কিন্তু তারপর পুঁজি প্রতিদিন বাড়ছে কী করে ?

সাধারণত মনে হবে, পুঁজিবাদীরা কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করে তাদের পুঁজির পরিমাণ বাড়াচ্ছে। কিন্তু গোটা সমাজকে যদি আমরা ধরি, তা হলে দেখবো, এই কেনাবেচার মধ্যে দিয়ে মোট মুনাফা বাড়ে না। সুতরাং এই পদ্ধতিতে মোট পুঁজির পরিমাণও বাড়তে পারে না। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরো, সমাজে রাম, শ্যাম ও যদু—এই তিনজন পুঁজিপতি কেনাবেচা করছে। রাম শ্যামের কাছ থেকে ১০০ টাকায় একটা মাল কিনে যদুর কাছে বেচলো ১১০ টাকায়। রামের লাভ হলো ১০ টাকা। শ্যাম রামের কাছে ১০০ টাকায় যা বেচলো তা আবার কিনেছে যদুর কাছ থেকে ৯০ টাকায়। শ্যামেরও লাভ হলো ১০ টাকা। আর যদু ? আগেই দেখেছি যদু রামের কাছ থেকে কিনেছে ১১০ টাকায়। আর বেচেছে শ্যামের কাছে ৯০ টাকায়।

তা হলে যত্নর লোকসান হলো ২০ টাকা। এখন যদি আমরা মোট হিসাব করি, তা হলে দেখবো, তিনজনের মোট কেনা দর হলো ৩০০ টাকা, আর বেচার দরও হলো ৩০০ টাকা। অর্থাৎ লাভ কিছুই হলো না। অবশ্য রাম ও শ্যামের ১০ টাকা করে লাভ হলো, কিন্তু যত্নর ২০ টাকা লোকসানের সঙ্গে তা আবার কাটাকাটি হয়ে গেলো। ফলে বিনিময়ের আগে রাম, শ্যাম, যত্ন —এই তিনজন পুঁজিপতির মোট যে ৩০০ টাকা পুঁজি ছিলো বিনিময়ের পরে তাই-ই থেকে গেলো। সুতরাং বিনিময়ের ফলে একজনের টাকা আর একজনের পকেটে যায়, কিন্তু মোট পুঁজির পরিমাণ বাড়ে না।

তবে সমাজের মোট পুঁজির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে কী করে?

সহজ কথায় এর জবাব হচ্ছে, শ্রমিকদের শোষণ করে। পুঁজিপতিরা কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্যে যে-পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করে, শ্রমিকদের খাটিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য আদায় করে নেয়। যেমন, একখানা কাপড় তৈরি করার জন্যে মালিক কাঁচামাল, কলকব্জা, মজুরি ইত্যাদি সব-কিছু বাবদ পুঁজি নিয়োগ করলো ৫ টাকা, আর সেই কাপড় যখন তৈরি হলো তখন তার দাম হলো ৭ টাকা। এই যে ২ টাকা বাড়তি মূল্য, তা হলো শ্রমিকের পরিশ্রমের ফল। এই বাড়তি মূল্য আত্মসাৎ করেই পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজি বাড়াচ্ছে।

বাড়তি মূল্য কী এবং কীভাবে মালিক তা আদায় করে, সে-ব্যাপার ভালো করে বুঝতে হলে মূল্য কথাটার অর্থ এবং কীভাবে মূল্য ঠিক হয়, তা বোঝা দরকার।

॥ মূল্য কী এবং কীভাবে ঠিক হয় ॥

মূল্য বলতে অনেক রকম অর্থ হয়। মরুভূমির মধ্যে তৃষ্ণার্ত পথিকের কাছে জল খুব মূল্যবান। তোমার মা তোমার জন্মদিনে একটা উপহার দিলেন, সেটাও তোমার কাছে খুব মূল্যবান। কিন্তু এই মূল্যের আলোচনা আমরা করছি না। বাজারে যে-মূল্যে পণ্য কেনাবেচা হয় সেই মূল্যের কথাই আমরা আলোচনা করছি। এই মূল্যকে বলে বিনিময়-মূল্য।

কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্য থাকতে হলে সর্বপ্রথম তার দুটো গুণ থাকা চাই। প্রথমত, সেই পণ্য লোকের কাজে লাগা চাই। যে-জিনিস কারু কোনো কাজে লাগে না সে-জিনিস কেউ কিনবে না। পণ্যের এই গুণকে বলে ব্যবহারিক মূল্য। কিন্তু শুধু ব্যবহারিক মূল্য থাকলেই কোনো জিনিস কেনাবেচা হয় না। সূর্যের আলোর ব্যবহারিক মূল্য খুবই বেশি। কিন্তু তাই বলে বাজারে কেউ সূর্যের আলো বিক্রি করে না। তাই সূর্যের আলোর ব্যবহারিক মূল্য থাকা সত্ত্বেও কোনো বিনিময়-মূল্য নেই। কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্য থাকতে হলে শুধু তার ব্যবহারিক মূল্য থাকলেই চলবে না, তাকে মানুষের পরিশ্রমের ফল হতে হবে। যে-জিনিস পেতে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না, তা কেউ পয়সা দিয়ে কেনে না। কিন্তু আবার পরিশ্রম করে কিছু তৈরি করলেই তার বিনিময়-মূল্য থাকে না। তুমি যদি সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়ির সব চাল আর ডাল একত্র করে মেশাও আর তারপর আবার চাল আর ডালকে আলাদা করে বেছে রাখো, তা হলে

সেই পরিশ্রম কোনো মূল্য সৃষ্টি করবে না, কারণ তোমার এতো পরিশ্রম মানুষের কোনো কাজে লাগবে না। পরিশ্রম দিয়ে মূল্য সৃষ্টি করতে হলে সেই পরিশ্রম সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় হওয়া চাই।

সুতরাং কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্য থাকতে হলে প্রথমত তার ব্যবহারিক মূল্য থাকা চাই ; দ্বিতীয়ত তা এমন পরিশ্রমের ফল হওয়া চাই যে-পরিশ্রম সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

কিন্তু দুটি পণ্যের মধ্যে বিনিময়-মূল্য ঠিক হবে কী করে? বিভিন্ন পণ্যের বিভিন্ন ব্যবহারিক মূল্য। যেমন, একটি আলমারি ও একখানা কাপড়। আলমারি ও কাপড়ের আলাদা ব্যবহারিক মূল্য। কাপড় লোকে পরে, আর আলমারিতে জিনিসপত্র রাখে। ব্যবহারিক মূল্যের দিক থেকে একেবারে আলাদা এই দুটি পণ্যের মধ্যে বিনিময়-মূল্য ঠিক হবে কী করে? হবে এই দুটি পণ্য তৈরি করতে কতোটা পরিশ্রম লেগেছে সেই হিসাব দিয়ে। একখানা কাপড় আর একটি আলমারি তৈরি করতে যদি সমান পরিশ্রম লাগে তবে তাদের বিনিময়-মূল্যও সমান হবে। আলমারি তৈরি করতে যদি কাপড়ের চেয়ে বেশি সময় লাগে তবে আলমারির বিনিময়-মূল্যও বেশি হবে।

কিন্তু এই সময়ের হিসাব হবে কী করে? একজন ওস্তাদ মিস্ত্রি যে সময়ের মধ্যে একটি আলমারি তৈরি করবে একজন আনাড়ি মিস্ত্রি তার চেয়ে অনেক বেশি সময় নেবে। সুতরাং কার সময়টা হিসাবে ধরা হবে? মূল্য কোনো এক ব্যক্তির পরিশ্রমের সময় দিয়ে হিসাব করা হবে না, হবে গড়পড়তা সময়ের হিসাব

দিয়ে। ধরো, সমাজে মোট তিনটে আলমারি তৈরি হয়েছে। প্রথমটা তৈরি করতে সময় লেগেছে ৪ ঘণ্টা, দ্বিতীয়টায় ৫ ঘণ্টা এবং তৃতীয়টায় ৬ ঘণ্টা। তা হলে তিনটে আলমারি তৈরি করতে মোট সময় লাগলো ১৫ ঘণ্টা। সুতরাং গড়ে প্রত্যেকটার জন্যে সময় লাগলো ৫ ঘণ্টা। এই ৫ ঘণ্টার পরিশ্রম দিয়ে আলমারির মূল্য ঠিক হবে। যে-মিস্ত্রি ৪ ঘণ্টায় আলমারি তৈরি করেছে সেও ৫ ঘণ্টার মূল্য পাবে, আর যে ৬ ঘণ্টায় করেছে সেও ৫ ঘণ্টার পাবে।

সুতরাং সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রমের গড়পড়তা হিসাব অনুযায়ী পণ্যের বিনিময়-মূল্য নির্ধারিত হবে।

কিন্তু পণ্য যখন কেনাবেচার জন্যে বাজারে এলো তখন এই শ্রমের হিসাব দিয়ে সব সময় তার দাম ঠিক হয় না। কারণ পণ্যের বাজারদর শুধু উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় শ্রমের ওপর নির্ভর করে না, করে বহুলাংশে পণ্যের চাহিদা ও আমদানির ওপর। বাজারে যদি চাহিদার তুলনায় পণ্যের আমদানি বেশি থাকে তা হলে পণ্যের দাম কমে যায়। আবার আমদানির তুলনায় চাহিদা বেশি থাকলে দাম চড়ে যায়। এর ফলে হয়তো ধারণা হতে পারে যে কেবলমাত্র চাহিদা ও আমদানির ওপরই পণ্যের দাম নির্ভর করে। কিন্তু তা সত্য নয়। কারণ চাহিদা ও আমদানির অবস্থা বুঝে একটা নির্দিষ্ট মানের ওপরে বা নিচে পণ্যের দাম ওঠা-নামা করে। পণ্যের চাহিদা ও আমদানির দ্বারা এই মান নির্ধারিত হয় না, হয় সেই পণ্য উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় সময়ের পরিমাপ দ্বারা।

পণ্যের বিনিময়-মূল্য নির্ধারণের এই যদি ভিত্তি হয় তা হলে পণ্যের আসল উৎপাদক শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য ঠিক হবে কীভাবে? ধনিক সমাজে শ্রমিকের শ্রমশক্তিও একটা পণ্য, কারণ আর পাঁচটা পণ্যের মতোই এর কেনাবেচা হয়। শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বেচে, আর মালিক মজুরি অর্থাৎ তার দাম দিয়ে তা কিনে নেয়। সুতরাং অন্যান্য পণ্যের মতোই এই পণ্য তৈরি করতে যতোখানি শ্রম দরকার তা দিয়ে এর মূল্য ঠিক হয়। অর্থাৎ শ্রমিককে শ্রমশক্তি খাটাতে হলে নিজেকে ও পরিবারকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এর জন্যে শ্রমিকের যা খরচা হয় তাই দিয়ে তার শ্রমশক্তির মূল্য ঠিক হবে। ধনিক সমাজে শ্রমিকদের পরিবারের কথাটাও পুঁজিপতিদের ভাবতে হয়, কারণ শ্রমিক পরিবারগুলি যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তা হলে শ্রমিকের অভাবে পুঁজিপতিদের কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যাবে। তাই শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারণের সময় শ্রমিকের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার খরচটাও হিসাবের মধ্যে ধরতে হয়।

কিন্তু অন্যান্য পণ্যের বাজারদর যেমন সবসময় তার প্রকৃত বিনিময়-মূল্যের সমান হয় না, শ্রমিকের মজুরিও তেমনি তার শ্রমশক্তির চেয়ে বেশি বা কম হতে পারে। চাহিদা ও আমদানি অন্যান্য পণ্যের বাজারদরের মতো শ্রমশক্তির বাজারদর মজুরির হারকেও অনেকক্ষেত্রে প্রভাবিত করে। চাহিদার তুলনায় শ্রমশক্তির আমদানি যাতে বেশি থাকে তার জন্যে পুঁজিপতিরা সবসময়ই একটি বেকার বাহিনী মজুদ রাখার পক্ষপাতী।

চাহিদা ও আমদানি ছাড়া মজুরির হার নির্ভর করে শ্রমিক শ্রেণীর একতা ও সংঘশক্তির ওপর।

॥ বাড়তি মূল্য ॥

শ্রমিকের শ্রমশক্তির আবার একটা বিশেষ গুণ আছে যা অন্য কোনো পণ্যের নেই। অন্যান্য পণ্য ব্যবহার করলে তার মূল্য বাড়ে না। যেমন একখানা কাপড়। তুমি যতোই ব্যবহার করো তার মূল্য বাড়বে না। কিন্তু শ্রমশক্তি তার নিজস্ব মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য উৎপাদন করতে পারে। যেমন ধরো, একজন শ্রমিকের একদিনের শ্রমশক্তির মূল্য ১ টাকা। কিন্তু মালিক পুরো দিন সেই শ্রমশক্তি খাটিয়ে যে-পণ্য উৎপাদন করবে তার মূল্য এক টাকার চেয়ে অনেক বেশি। একে বলে বাড়তি মূল্য। বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে বলেই পুঁজিপতিরা শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনে নেয়।

বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হয় কীভাবে? ধরো, একজন কাপড়ের কলের শ্রমিক। রোজ ১ টাকা দামে মালিক দিনে আট ঘণ্টার জন্যে তার শ্রমশক্তি কিনে নিলো। শ্রমিকটি ৪ ঘণ্টা খেটে ১ টাকার মূল্য তৈরি করলো। অর্থাৎ শ্রমশক্তি কেনার জন্যে মালিককে যে মূল্য দিতে হয়েছিলো শ্রমিকটিকে ৪ ঘণ্টা খাটিয়েই মালিক তা উশুল করে নিলো। কিন্তু চুক্তিমতো শ্রমিককে খাটতে হবে আরও ৪ ঘণ্টা, অর্থাৎ মোট আট ঘণ্টা। পরের এই চার ঘণ্টার জন্য যে-শ্রমশক্তি ব্যয় হলো তার কোনো মূল্য শ্রমিক পেলো না, সবটাই নিয়ে নিলো মালিক। এই চার ঘণ্টার পরিশ্রমে যে-মূল্য

তৈরি হলো সেটাই বাড়তি মূল্য।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা আর একটু পরিষ্কার হবে। ধরো, আমাদের এই শ্রমিকটি। মালিক তাকে নগদ ১ টাকা মজুরি দিলো, আর দিলো সুতো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। দিয়ে বললো, এখন কারখানায় বসে ৮ ঘণ্টা কাজ করো। মালিক শ্রমিকটিকে যে সুতো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিলো তা কোনো নতুন মূল্য সৃষ্টি করবে না, কারণ ওসবের যা মূল্য তা তৈরি কাপড়ের ভেতরে চলে এলো। আমরা আগেই দেখেছি শ্রমিকটি ৪ ঘণ্টার মধ্যে ১ টাকার অর্থাৎ তার মজুরির সমান মূল্য সৃষ্টি করে। তাহলে ঘণ্টায় সে তৈরি করে চার আনার মূল্য। আর ঘণ্টায় সুতো, কলকব্জার ইত্যাদির যে-মূল্যটা কাপড়ের ভেতর চলে যায় তাও ধরো চার আনার সমান। তাহলে ঘণ্টায় যে-পণ্য তৈরি হলো তার মূল্য আট আনা। সুতরাং ৮ ঘণ্টায় হলো ৪ টাকা। এখন দেখো, আট ঘণ্টায় মালিকের কতো খরচা হয় : মজুরি ১ টাকা এবং সুতো যন্ত্রপাতিইত্যাদির মূল্য ২ টাকা=মোট ৩ টাকা। অর্থাৎ শ্রমিক-পিছু মালিক দৈনিক ৩ টাকার পুঁজি খাটিয়ে পেলো ৪ টাকা। মালিকের কারখানায় যদি এক হাজার শ্রমিক খাটে তাহলে মালিকের দৈনিক খরচা হবে ৩০০০ টাকা, আর দৈনিক আমদানি হবে ৪০০০ টাকা। এই বাড়তি ১০০০ টাকাটা হচ্ছে বাড়তি মূল্য যা একহাজার শ্রমিকের শ্রমশক্তি খাটিয়ে মালিক উশুল করে নিলো।

পুঁজিপতিরা তাদের পুজি দিয়ে দুরকম জিনিস কেনে। এক হচ্ছে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কারখানার বাড়িঘর ইত্যাদি। আর

হচ্ছে শ্রমিকের শ্রমশক্তি। আমরা আগেই দেখেছি, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর ইত্যাদি কোনো নতুন মূল্য সৃষ্টি করে না। নতুন মূল্য সৃষ্টি করে শ্রমশক্তি। এই জন্যে শ্রমশক্তিকে বলে পরিবর্তনশীল পুঁজি এবং কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে বলে অ-পরিবর্তনশীল পুঁজি, অর্থাৎ যার কোনো পরিবর্তন হয় না। শ্রমশক্তি বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে বলে পুঁজিপতিরা সব সময়েই চেষ্টা করে শ্রমশক্তির জন্যে খরচা কমাতে। কারণ শ্রমশক্তির জন্যে যতো কম খরচা হবে বাড়তি মূল্যের হারও ততো বাড়বে। পুঁজিপতিরা সাধারণত দুই উপায়ে শ্রমশক্তির জন্যে খরচা কমায়। প্রথমত, তারা সরাসরি মজুরি কমিয়ে দেয়। আমাদের আগের উদাহরণটা ধরো। সেখানে শ্রমিকটি রোজ মজুরি পেতো ১ টাকা। একে কমিয়ে যদি আট আনা করা যায় তাহলে মালিক বেশি বাড়তি মূল্য উশুল করতে পারবে। কীভাবে? আমাদের আগের উদাহরণ অনুসারে আট আনা মজুরি হলে শ্রমিকটি দু ঘণ্টার মধ্যেই সমমূল্যের পণ্য উৎপাদন করতে পারবে এবং বাকি ছ ঘণ্টা মালিক তাকে মাগনা খাটিয়ে বেশি বাড়তি মূল্য উশুল করতে পারবে। বাড়তি মূল্যের হার বাড়াবার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, শ্রমিককে দিয়ে একই সময়ে বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া। এই জন্যে পুঁজিপতিরা নতুন নতুন কল বসায় যাতে দু ঘণ্টার কাজ একঘণ্টায় করা যায়। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্রমিকেরা যাতে একটু বিশ্রাম করতে না পারে তা দেখার জন্যে কারখানায় কড়া পাহারা বসায়। আজকাল খবরের কাগজে কারখানায় দুর্ঘটনার খবর প্রায়ই দেখা যায়। শ্রমিকদের দিয়ে কম সময়ে বেশি কাজ করানোর ফলেই

অধিকাংশ দুর্ঘটনাগুলো ঘটে।

এইভাবে পুঁজিপতিরা বাড়তি মূল্য আদায় করে। বাড়তি মূল্যই হচ্ছে পুঁজিপতিদের মুনাফার উৎস—বাড়তি মূল্য যতো বেশি হবে মুনাফাও ততো বাড়বে। তাই পুঁজিপতিরা সবসময়েই চেষ্টা করে কী করে শ্রমিকদের ওপর শোষণের মাত্রাটা বাড়িয়ে বাড়তি মূল্যের পরিমাণটা আরও বাড়ানো যায়। এই বাড়তি মূল্যের একটা অংশ মালিক নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে ব্যয় করে, বাকিটা নতুন পুঁজি হিসাবে আবার শিল্পে নিয়োগ করা হয়। পুঁজিবৃদ্ধির ফলে মালিক আরও বেশি শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনতে পারে। বেশি শ্রমিক নিয়োগের ফলে মালিকের প্রাপ্য বাড়তি মূল্যের পরিমাণ-টাও অনেক বেড়ে যায়, ফলে মালিকের হাতে পুজির পরিমাণও বাড়ে। এইভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চক্রাকারে বাড়তি মূল্য এবং সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির পরিমাণ বেড়ে চলে।

॥ পুঁজিবাদের ফল—ব্যবসা-সংকট ॥

কিন্তু এই একটানা পুজি বাড়ানোর ফলেই আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট দেখা দেয়।

বাজার দখলের জন্যে পুঁজিপতিদের পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হয়। যে পুঁজিপতি সবচেয়ে কম দামে তার পণ্য বিক্রি করতে পারে সে-ই এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। সুতরাং পুঁজিপতিরা সবসময়েই চেষ্টা করতে থাকে যাতে খুব কম খরচায় বেশি মাল তৈরি করাতে পারে। এই জন্যে তারা নতুন নতুন

কল বসিয়ে আরও পুজি ঢেলে কারখানা বড়ো করে। কারণ যে পুঁজিপতির কারখানা যতো বড়ো হবে, যার কারখানায় যতো বেশি আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকবে, সেই ততো কম খরচায় বে শিমাল তৈরি করতে পারে। আর কম খরচায় যে বেশি মাল তৈরি করতে পারবে সে-ই সস্তায় মাল বেচে অন্যদের হারিয়ে বাজার দখল করে নেবে। এইভাবে বাজার দখলের জন্যে পুজিপতিদের মধ্যে পুঁজি বাড়াবার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতার ফল হয় উলটো। ছোটো ও মাঝারি পুঁজিপতিরা বড়োদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। সমাজের শিল্প-বাণিজ্যের দখল ক্রমেই মুষ্টিমেয় বড়ো পুঁজিপতিদের হাতে এসে পড়ে। এইভাবে সৃষ্টি হয় এক দল একচেটিয়া পুঁজিপতি (monopoly capitalist)। প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেই আজকাল এরকম একচেটিয়া পুঁজিপতি-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অন্যদের কীরকম কোণঠাসা করছে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যতো মোটরগাড়ি তৈরি হয়েছে তার শতকরা ৮৭ ভাগ তৈরি করেছে জেনারেল মোটরস্, ক্রাইসলার ও ফোর্ড —এই তিনটে সর্ববৃহৎ কোম্পানি। অন্যান্য ছোটো ও মাঝারি কোম্পানিগুলি তৈরি করেছে শতকরা ১৩ ভাগ। এক বছরের মধ্যেই এই রাঘব-বোয়াল কোম্পানি তিনটি ছোটোদের সামান্য ভাগটাও গ্রাস করে নিলো। ১৯৫৩ সালের হিসেবে দেখা যায়, এই তিনটি কোম্পানির অংশ ৮৭ ভাগ থেকে বেড়ে ৯৬ ভাগ হয়েছে আর ছোটোদের অংশ ১৩ থেকে কমে ৪-এ দাঁড়িয়েছে।

এই প্রতিযোগিতার ফলে শুধু যে ছোটো ও মাঝারি পুঁজিপতিরাই মারা যায় তাই নয়। কারখানায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসাবার ফলে শ্রমিকদের প্রয়োজনও কমে যায়, কারণ শ্রমিকদের অনেক কাজ যন্ত্রই করে দেয়। ফলে হু হু করে বেকারের সংখ্যা বাড়ে। আর যারা ছাঁটাই হয় না তাদের মজুরিও পুঁজিপতিরা কমিয়ে দেবার স্থযোগ পায়। এইভাবে গোটা শ্রমিক শ্রেণী গরিব হয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আক্রমণ থেকে বাঁচে না। ব্যবসাবাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া দখল কায়েম হবার ফলে ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ী, দোকানদার প্রভৃতির ব্যবসা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষকরাও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছ থেকে তাদের উৎপন্ন কাঁচা মালের উপযুক্ত দাম না পেয়ে ক্রমেই গরিব হয়ে পড়ে। এক কথায় মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ছাড়া সমাজের আর সবাই ক্রমেই গরিব হতে থাকে।

এর ফলে দেখা দেয় ব্যবসা-সংকট। বাজারে পণ্যের প্রধান ক্রেতা শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তরা; কারণ সংখ্যায় তারাই সমাজের দশ ভাগের ন ভাগ। ক্রেতাদের অধিকাংশের হাতে যখন মাল কেনার মতো যথেষ্ট পয়সা থাকে না, তখন বাজারে মাল জমে যায়। দাম কমালে হয়তো কিছুটা বিক্রি হতে পারে। কিন্তু পুঁজিপতিরা প্রাণ থাকতে তা করবে না! কারণ দাম কমালে তাদের লাভও কমে যাবে। স্থতরাং অবিক্রীত মালে গুদাম ভরে ওঠে, কারখানার পর কারখানা বন্ধ হতে থাকে, হাজার হাজার শ্রমিক চাকরি হারিয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে।

এই সংকট থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে পুঁজিপতিরা নানা কৌশল অবলম্বন করে। সর্বপ্রথম তারা মুনাফার হার বাড়াবার জন্যে শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আজকাল খবরের কাগজে তোমরা 'র‍্যাশনালাইজেশন' কথাটা প্রায়ই দেখো। 'র‍্যাশনালাইজেশন' হচ্ছে শ্রমিকদের শোষণের মাত্রা বাড়াবার একটা উপায়। এই ব্যবস্থায় এমন সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় যাতে করে শ্রমিকদের অল্প সময় খাটিয়ে বেশি কাজ আদায় করে নেওয়া যায়, অর্থাৎ বাড়তি মূল্যের হার বাড়িয়ে দেওয়া যায়। এ ছাড়া, শ্রমবিভাগও এমনভাবে করা হয় যাতে শ্রমিকরা একদণ্ড বিশ্রাম করার অবসরও না পায়। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের মজুরির হার কিছুটা বাড়ে কিন্তু শোষণের মাত্রাটা বাড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে মালিকের মুনাফার হারও বেড়ে যায়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৯-৫২ সালের মধ্যে র‍্যাশনালাইজেশনের ফলে শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ১৩ ভাগ, আর মজুরি বেড়েছে মাত্র শতকরা ৭ ভাগ।

শ্রমিকদের ওপর শোষণের মাত্রা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতিরা অবিক্রীত পণ্য ও যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলে। ১৯২৯-৩৩ সালের ব্যবসা-সংকটের কথা যারা পড়েছো তারা জানো, সেবার কীভাবে আমেরিকায় কোটি কোটি মন গম পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো, লক্ষ লক্ষ টন কফি আমাজন নদীর জলে চুবিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, পর্বতপ্রমাণ ফলের স্তূপ অতলান্তিক সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। অথচ সেই সময় আমেরিকায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মজুর বেকার হয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলো। এইসব খাদ্য

নষ্ট না করে এই অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকদের দলে তারা বেঁচে যেতো। কিন্তু পুঁজিপতিরা তা করবে না, তাতে তাদের বাজার নষ্ট হয়!

এ বছরের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এ বছর পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই প্রচুর খাদ্যশস্য ফলেছে। ফলে খাদ্যশস্যের দাম পড়ে গেছে। অন্য সমাজব্যবস্থায় এরকম হলে জনসাধারণ সস্তা দরে বেশি খাদ্য পেতো। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে তা হবার উপায় নেই। এখানে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বাজারের মন্দা দেখা দিয়েছে। সস্তায় গম বিক্রি করলে মুনাফা কম হবে বলে আমেরিকা ও কানাডার পুঁজিপতিরা প্রচুর গম গুদামজাত করে রেখেছে। কিন্তু দিন কয়েক পরে এই গম হয়তো পুড়িয়ে ফেলা হবে। কানাডার পুঁজিপতিরা ঠিক করেছে, আগামী বছর কম জমিতে গম চাষ করা হবে যাতে কম গম উৎপন্ন হয় এবং গমের দাম আবার চড়ে যায়। পুঁজিপতিরা এইভাবে উৎপন্ন খাদ্যশস্য আটকে রাখছে, নষ্ট করে দিচ্ছে। অথচ কতো দেশে কতো লোক একমুঠো খাদ্যের জন্যে হাহাকার করছে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা তাই শুধু ব্যবসা-সংকটই সৃষ্টি করে না, এই ব্যবস্থায় সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতার অপপ্রয়োগও হয়। যে উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের অভাব দূর হতে পারে পুঁজিপতিরা নিজেদের মুনাফার স্বার্থে তাকে সংকুচিত করে রেখেছে, তার অপব্যবহার করছে।

কিন্তু শ্রমিকদের আরও বেশি শোষণ করে বা অবিক্রীত পণ্য ও যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দিয়েও সংকটের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া যায় না। তাই উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রির জন্যে, উদ্বৃত্ত পুঁজি খাটাবার

জন্যে, সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্যে পুঁজিপতিদের প্রয়োজন হয় অন্য দেশ দখল করার। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হয়। তবে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে সব সময়েই সৈন্য পাঠিয়ে সরাসরি অন্য দেশ দখল করার প্রয়োজন হয় না। কায়দা করে অন্য দেশের গবর্নমেন্টকে যদি নিজের তাঁবেদারে পরিণত করা যায় তা হলেও এই একই উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়। যেমন বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য পাঠিয়ে অন্য দেশ সরাসরি দখল না করেও টাকা দিয়ে, যুদ্ধঘাঁটি বসিয়ে এবং আরও নানা কায়দায় একাধিক দেশের গবর্নমেন্টকে তাদের হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে।

॥ পুঁজিবাদ → সাম্রাজ্যবাদ ॥

এইভাবে সংকটগ্রস্ত পুজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয়। সাম্রাজ্যবাদকে তাই আমরা পুজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর বলতে পারি।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী?

সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একচেটিয়া কারবারের বিপুল প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি। স্বাধীন প্রতিযোগিতার ধ্বজা তুলেই একদা ধনিক শ্রেণী সামন্ত-প্রভুদের হটিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করেছিলো। কিন্তু আজ প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতির করতলগত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশির ভাগ রকফেলার, ডুপঁ, মর্গান, মেলন, ক্লিভল্যাণ্ড, ফোর্ড প্রভৃতি কয়েকটি একচেটিয়া পুঁজিপতি

গোষ্ঠীর কুক্ষিগত। সেখানে মোটর গাড়ি উৎপাদনের শতকরা ৯৬ ভাগ চারটি কোম্পানির দখলে। অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগই একটি কোম্পানি করে থাকে। লোহা উৎপাদনের ৬০ ভাগ চারটি কোম্পানির হাতে। ব্রিটেনের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল কোম্পানি অ্যাসিড, সোডা ইত্যাদি মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ দখল করে রেখেছে।

শুধু শিল্পেই নয়, ব্যাঙ্কের মধ্যে দু-পাঁচটা বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক অন্যদের হটিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্কের জগতে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেছে। বিলেতে ১৯০০ সালে ব্যাঙ্ক ছিলো ৯৮টা। ১৯১৩ সালে মাত্র ২৬টা টিকে ছিলো, বাকিগুলো সব ফেল পড়েছে। এই ২৬টার মধ্যে ৫টা হচ্ছে আবার প্রধান, এরাই অন্য সবগুলোকে চালায়।

শুধু তাই নয়, এই বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলির কর্তারা ক্রমে ক্রমে শিল্পের অধিপতি হয়ে বসেছে। ইতিপূর্বে ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন শিল্পকে টাকা ধার দিতো এবং সুদ পেতো। কিন্তু সরাসরি শিল্পের মালিক তারা ছিলো না। এই অবস্থাটা এখন বদলে গেছে। এখন বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কের মালিকরা টাকার জোরে সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থারও মালিক হয়ে বসেছে। ১৯১৩ সালে বিলেতের প্রধান পাঁচটা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টররা শিল্পে-নিযুক্ত ৩২৯টা কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলো। ১৯৩৯ সালে তারা ১১৫০টি কোম্পানির ডিরেক্টর হয়। এই কোম্পানিগুলির মধ্যে ইম্পি-রিয়াল কেমিক্যাল কোম্পানিও আছে। এইভাবে সমাজে এক

নতুন ধরনের মালিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে উৎপাদনের সঙ্গে যাদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, অথচ নেপথ্যে থেকে ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনা-বেচা করে যারা গোটা উৎপাদন-ব্যবস্থাকে দখল করে নিয়েছে।

এইভাবে শিল্প ও বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের ফলে বর্তমানে পুজিপতিদের যে-লাভ হচ্ছে স্বাধীন প্রতি-যোগিতার যুগে পুঁজিপতিরা তা কল্পনা করতে পারতো না। যেমন, ১৯৫২ সালে মার্কিন পুঁজিপতিদের মুনাফা হয়েছে প্রায় ৪১৫০ কোটি পাউণ্ড (প্রায় ৫৬০২৫ কোটি টাকা)। এই বিপুল অর্থ দেশের বাজারে খাটাবার সুযোগ খুবই কম; কারণ সংকটের ধাক্কায় সেখানে অবিক্রীত পণ্যের স্তপ হয়ে আছে। সুতরাং এই নতুন পুঁজি বিদেশের বাজারে খাটাবার চেষ্টা চলে। পশ্চাদপদ দেশেই যে এই পুজি খাটানো হয় তা নয়, সুযোগ বুঝে পুজিবাদী উৎপাদনের দিক দিয়ে অগ্রসর দেশেও এই পুঁজি খাটানো হয়। পুজিবাদের প্রথম যুগে রপ্তানি হতো পণ্য, এখন রপ্তানি হচ্ছে ক্রমাগত পুঁজি। কারণ এতে ভালো সুদ পাওয়া যায় আর মুনাফাও ওঠে বেশি। বিদেশে পুঁজি খাটিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা কী রকম মুনাফা করে এবং সেই সব দেশের মানুষকে কীভাবে শোষণ করে তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। মার্কিন একচেটিয়া কোম্পানি জেনারেল মোটরস-এর বিদেশে একাধিক কারখানা আছে। ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫০, এই তিন বছরে তারা স্বদেশের কারখানা থেকে মুনাফা করেছে শতকরা ২৫.৫, ৩১·৪৩ ৩৪·৯ ভাগ হারে। আর বিদেশের শাখাগুলি থেকে

মুনাফা করেছে যথাক্রমে শতকরা ৮২, ১১২ ও ১১৫ ভাগ হারে। বিদেশে পুঁজি খাটিয়ে যে এতো মুনাফা হয় তার কারণ, বিদেশে বিশেষ করে পশ্চাৎপদ দেশে শোষণ করার সুবিধা অনেক বেশি। যেমন আরবদেশে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলি আরব শ্রমিকদের যে মজুরি দেয় তা মার্কিন শ্রমিদের মজুরির দশ ভাগের এক ভাগ। অথচ আরব শ্রমিকের কর্মক্ষমতা মার্কিন শ্রমিকের চেয়ে কম নয়। নগদ টাকায় এই লাভ ছাড়া আরও একটা লাভ হচ্ছে যে, যে-দেশে পুঁজি রপ্তানি করা হয় সে-দেশকেও কায়দা করে দখলে আনা যায়।

এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজি রপ্তানি বেড়েই চলেছে। কী হারে এই রপ্তানি বাড়ছে, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিলেই বোঝা যায়।

১৯৪৩ সালে মার্কিন পুঁজিপতিরা বিদেশে রপ্তানি করেছিলো ৮০০ কোটি ডলার, ১৯৫০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১২০০ কোটি ডলার এবং ১৯৫২ সালে হয়েছে ১৪০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে খাস ব্রিটেনে মার্কিন পুঁজির পরিমাণ হচ্ছে ৮৪ কোটি ডলার।

পুঁজিবাদী দেশের এই ধনকুবেররা শুধু যে নিজেদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য কুক্ষিগত করে তাই নয়, এরা অন্যান্য দেশের ধনকুবেরদের সঙ্গে চুক্তি করে পৃথিবীর বাজারটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবার চেষ্টা করে। এমনিভাবে গত যুদ্ধের আগে মার্কিন ধনকুবের মর্গানদের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি একটা জার্মান একচেটিয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে

পৃথিবীর বৈদ্যুতিক পণ্যের বাজার প্রায় দখল করে নিয়েছিলো। আর একজন মার্কিন ধনকুবের রকফেলারের ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি এইভাবে বর্তমানে আর কয়েকটি বড়ো বড়ো তেল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে পৃথিবীর তেলের বাজার প্রায় দখল করে নিয়েছে।

কিন্তু একচেটিয়া এই কোম্পানিগুলির মধ্যে পৃথিবীর বাজার ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবার চুক্তি বেশি দিন টেকে না। কারণ প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশই সংকটে বিপন্ন। তাই প্রত্যেকেই চায় অন্যদের কোণঠাসা করে নিজেদের সুবিধা করে নিতে। এই চুক্তিগুলি হচ্ছে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক যুদ্ধের সাময়িক বিরতি-মাত্র। কিন্তু যেই কোনো দেশ উৎপাদনের পড়তা কমাবার নতুন কোনো প্রণালী বা নতুন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করে তখনি তারা চুক্তি উপেক্ষা করে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির বাজারে প্রতিযোগিতা শুরু করে, ফলে চুক্তি ভেস্তে যায়, তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

আমরা গণতন্ত্রের আলোচনার সময় দেখেছি, পুঁজিপতিরা কীভাবে তাদের নিজের নিজের দেশের গবর্নমেণ্ট দখল করে রেখেছে। শিল্পবাণিজ্যের ওপর তাদের একচেটিয়া দখল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পুজিপতিরা নিজের নিজের দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকেও সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করে নিয়েছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপ-রাষ্ট্রপতি নিক্সন ধনকুবের হ্যপর্ঁ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। পররাষ্ট্র-সচিব ডালেস রকফেলার গোষ্ঠীর লোক। যুদ্ধমন্ত্রী উইলসন হ্যপর্ঁ'র জেনারেল মোটরস্-এর প্রধান কর্তা। পারস্পরিক নিরাপত্তা দপ্তরের মন্ত্রী ষ্টাসেন মর্গান গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি

মন্ত্রীই এইভাবে কোনো-না-কোনো একচেটিয়া ধনকুবের গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। বিলেতেও তাই। স্বয়ং চার্চিল ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালের একজন বড়ো অংশীদার। উপনিবেশ-সচিব লিটলটন একাধিক বৈদ্যুতিক ও ধাতুশিল্পের অন্যতম মালিক। গবর্নমেণ্টের ওপর এই দখলের সুযোগ নিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তাদের প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগায়। কিন্তু অর্থনৈতিক যুদ্ধে সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। তখন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত এই গবর্নমেণ্টগুলি পুঁজিপতিদের স্বার্থে বাজার রক্ষা ও বাজার দখলের জন্যে শুরু করে আসল যুদ্ধের প্রস্তুতি।

আজ সারা পুঁজিবাদী দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে। এই যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুধু যে সোবিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের বিরুদ্ধেই হচ্ছে তা মনে করার কোনো কারণ নেই; পুঁজিবাদী দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা আগে যেমন ছিলো এখনও তেমনি আছে। দখল করার মতো দেশ পৃথিবীতে আজ আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। উনবিংশ শতাব্দীতেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ১৮৭৬ সালে আফ্রিকার শতকরা ১১ ভাগ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দখলে ছিলো, ১৯০০ সালে শতকরা ৯০ ভাগ তারা দখল করে নেয়। এইভাবে প্রতিটি পশ্চাৎপদ দেশই আজ কোনো-না-কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশের দখলে। তাই শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলিকে আজ কোণঠাসা ও পদানত করার চেষ্টা করছে। ফলে পুঁজিবাদী

দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক যুদ্ধ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে।, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ব্রিটেন আজ তার শক্তিশালী প্রতিযোগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ক্রমেই কোণঠাসা হচ্ছে। যে-সব বাজারে এতোকাল ব্রিটেনের একচেটিয়া দখল ছিলো তা আজ হাতছাড়া হয়ে মার্কিন দখলে চলে যাচ্ছে। ব্রিটেনে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে মার্কিন পুঁজির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। কেবলমাত্র ১৯৫১ সালেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলিতে পুঁজি খাটিয়ে মার্কিন পুঁজিপতিরা স্থদ ও লভ্যাংশ আদায় করেছে ১৭ কোটি পাউণ্ড। অন্যান্য পুজিবাদী দেশগুলির মধ্যেও প্রতিযোগিতা ও তিক্ততা ক্রমেই বাড়ছে। স্থতরাং গত দুই মহাযুদ্ধের মতো আবারও যে পুজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বাজার নিয়ে যুদ্ধ বেধে যাবে না, তা জোর করে কেউ বলতে পারে না।

যুদ্ধের জন্যে পুঁজিবাদী দেশগুলি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তা আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই যুদ্ধের জন্যে ১৯৫১-৫২ সালে ব্যয় হয়েছে ৪০০০ কোটি ডলার, ১৯৫২-৫৩ সালে হয়েছে ৪৪০০ কোটি ডলার এবং ১৯৫৩-৫৪ সালের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৬০০ কোটি ডলার। ব্রিটেনে ১৯৫২-৫৩ সালে ব্যয় হয়েছে ১৫১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, আর ১৯৫৩-৫৪ সালে হবে ১৬৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড।

যুদ্ধের জন্যে এই বিপুল ব্যয়ের ফলে পুঁজিপতিদের পৌষমাস, কিন্তু সাধারণ মানুষের সর্বনাশ। যুদ্ধ খুব ভীষণ ব্যাপার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা ধনিক শ্রেণীর পক্ষে ভীষণ লাভজনকও বটে। যুদ্ধ ধনিক শ্রেণীর পক্ষে কী রকম লাভজনক তা কোরিয়া যুদ্ধের

হিসাবটা দেখলেই বোঝা যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ দুই শতটি কোম্পানির মুনাফার এক হিসাবে দেখা গেছে যে, তাদের মুনাফা ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ৫৩০ কোটি ডলার থেকে কমে ৫০০ ডলার হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ১৯৫০ সালে যেই কোরিয়াতে যুদ্ধ বাধলো অমনি তাদের মুনাফা এক লাফে বেড়ে হলো ৭৯০ কোটি ডলার এবং ১৯৫১ সালে আরও বেড়ে হলো ৮৬০ কোটি ডলার।

যুদ্ধ যেমন পুঁজিপতিদের মুনাফা জোগায়, তেমনি আবার সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে। যুদ্ধ শুরু হলে যে ক্ষতি হয় তা সবাই মানে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার আগেই যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্যেও সাধারণ মানুষকে অনেক কিছু খেসারত দিতে হয়। যুদ্ধের ব্যয়বৃদ্ধির জন্যে প্রথমত সাধারণ মানুষের ওপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়ে। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের জন্যে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে বলে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনহিতকর কাজের জন্যে ব্যয় ক্রমেই কমে যাচ্ছে। গত বছরের চেয়ে এবছরে ব্রিটেনে যুদ্ধের জন্যে ব্যয় বেড়েছে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু এই বাড়তি টাকা সংগ্রহ করার জন্যে একদিকে ট্যাক্স বাড়াতে হয়েছে অন্যদিকে বেসামরিক খাতে ব্যয় কমাতে হয়েছে ২৬ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড।

॥ পুঁজিবাদের শেষ অবস্থা ॥

ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যে পণ্য উৎপাদনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী সমাজ আজ আপন সংকটের জালে আটকে পড়েছে।

এই সংকট থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে তারা স্বদেশের সাধারণ মানুষকে শোষণ করে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। বিদেশের, বিশেষ করে পশ্চাৎপদ দেশগুলির, মানুষকে পদানত করে তাদের ধনসম্পদ লুটে নিচ্ছে। যুদ্ধ ও যুদ্ধপ্রস্তুতির সাহায্যে তারা তাদের শিল্প-বাণিজ্যের মন্দা আবার কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। আর এই সব-কিছুর সাহায্যে তারা চেষ্টা করছে স্বাভাবিক মুনাফা নয়, সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করতে।

কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথা আজ এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, সংকট থেকে উদ্ধার পাবার সব উপায়ই শেষ হয়ে গেছে বললেই চলে। পু জিবাদের সংকট আজ স্থায়ী হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই এতো যুদ্ধ ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট উৎপাদন-ক্ষমতার শতকরা মাত্র ৫৬ ভাগ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে, বাকি ৪৪ ভাগ অচল হয়ে আছে। ব্রিটেনে উৎপাদন বাড়ার বদলে ১৯৫২ সালে আগের বছরের তুলনায় উৎপাদন শতকরা ৩ ভাগ কমেছে। বেকার সংখ্যা প্রতিদেশে হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে।

আর এই সংকটের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্বিরোধগুলিও তীব্রতর হয়ে উঠছে। একদিকে পু জিবাদী দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে বিরোধ, অন্যদিকে পুঁজিবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে স্বদেশের শ্রমিক শ্রেণী এবং উপনিবেশের সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ বেড়েই চলেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই সংকটের কোনো সমাধান করতে পারে না। এই সংকটের ঘূর্ণীতেই পুঁজিবাদী সমাজ ভেঙে পড়বে।

কিন্তু ভেঙে পড়ার আগে পুঁজিবাদ একবার মরণকামড় দিতে ছাড়ে না। 'ফ্যাশিজম' হচ্ছে পুঁজিবাদের এই মরণকামড়।

অনেকের ধারণা, ফ্যাশিজম পুঁজিবাদ থেকে আলাদা কিছু। এ ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। আমরা আগেই দেখেছি, পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—(ক) ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যে পণ্য উৎপাদন (খ) উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং (গ) মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকদের খাটিয়ে বাড়তি মূল্য আদায় করা। পুঁজিবাদের এই সব ক'টি লক্ষণই ফ্যাশিজমের আছে। তাই ফ্যাশিজম পুঁজিবাদ থেকে আলাদা কিছু নয়।

কিন্তু তবুও ফ্যাশিজমের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে তার একটা আলাদা নামও হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটা কী? এই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে ফ্যাশিজমের হিংস্রতা। পুঁজিপতিদের মুনাফা, তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রমিক-শোষণের অধিকার রক্ষার জন্যে ফ্যাশিজম এমন হিংস্র উপায় অবলম্বন করে যা স্বাভাবিক অবস্থায় পুঁজিপতিরা করে না। পুঁজিবাদ যখন কিছুতেই নিজেদের ব্যবসা-সংকটের সমস্যা সমাধান করতে পারে না এবং তার ওপরে যখন শ্রমিক শ্রেণী বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের উপক্রম করে, তখন পুঁজিপতিদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বড়ো ও ক্ষমতাশালী তারা গণতন্ত্রের সমস্ত মুখোস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরাসরি নিজেদের একনায়কত্ব বা ডিকটেটরশিপ কায়েম করে, অস্ত্রের জোরে তারা শ্রমিক শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখে

চূড়ান্ত হিংস্রতার সঙ্গে তারা তাদের শোষণ ও শাসন চালিয়ে যায়। এইভাবে একদিকে ব্যবসাসংকট, অন্যদিকে শ্রমিকবিদ্রোহের বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে ১৯৩২ সালে ইতালিতে এবং ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে ফ্যাশিজমের জন্ম হয়।

ফ্যাশিস্তরা কী করে ক্ষমতার আসনে বসলো এবং বসে কী-ভাবে দেশ শাসন করলো সে সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিলে ফ্যাশিজমের চরিত্রটা আরও ভালো করে বোঝা যাবে।

একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, হিটলার ও মুসোলিনি বিদ্রোহ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলো। কিন্তু এই ধারণাটা আদৌ সত্যি নয়। হিটলার বা মুসোলিনি কেউ বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করেনি, দেশের সবচেয়ে বড়ো একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অন্যদের গবর্নমেণ্ট থেকে সরিয়ে এদের গবর্নমেণ্টে বসিয়েছিলো। কোনো মিলের ম্যানেজার যদি শ্রমিকদের সায়েস্তা করতে না পারে তবে মিলমালিক যেমন সেই ম্যানেজারকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কোনো জবরদস্ত লোককে ম্যানেজারের পদে বসায়, এও কতকটা সেই রকম। হিটলারকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলো থাইসেন, ক্রুপ প্রভৃতি জার্মানির সবচেয়ে বড়ো একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। জার্মানির সবচেয়ে বড়ো শিল্পপ্রধান অঞ্চল রূঢ়ের বড়ো বড়ো কয়লা-খনি ও ইস্পাত কারখানার মালিকরা প্রতিবছর হিটলারের নাৎসী দলকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতো। এই টাকা অবশ্য তারা কয়লার দাম বাড়িয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে উশুল করে নিতো। ১৯৩২ সালের নির্বাচনে একা থাইসেন কয়েকদিনের মধ্যে হিটলারকে ৩০ লক্ষ মার্ক (জার্মান মুদ্রা) দিয়েছিলো। জার্মান

কোটিপতিরা ছাড়া ফোর্ড, স্কোডা, ক্রুগার প্রভৃতি অন্যদেশের কোটিপতিরাও হিটলারকে প্রচুর টাকা দিয়েছে। এইভাবে দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও হিটলারকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে। ইতালিতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। ক্ষমতা পাবার আগেই ফ্যাশিস্তরা সেখানে শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্যে মারদাঙ্গা শুরু করে। এই কাজে তারা ধনিক-রাষ্ট্রের পুরো সাহায্য পেয়েছে। মুসোলিনির অন্যতম প্রধান সাকরেদ ভিল্লারি তার বই 'ফ্যাশিস্ত এক্সপেরিমেণ্ট'এ নিজেই এসম্পর্কে লিখেছে, "ফ্যাশিস্তরা সশস্ত্র দলে সংগঠিত হয়ে যেমন ইচ্ছা খুনজখম করতে পেরেছে কারণ তারা তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলো। এই কাজে তারা পুলিসের সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছে।"

এইভাবে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা হিটলার ও মুসোলিনিকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। হিটলার ও মুসোলিনি অবশ্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অনেক গরম গরম কথা বলেছে। কিন্তু চোর যেমন সাধু সাজার জন্যে মাঝে মাঝে গৃহস্থকে সাবধান হতে বলে এও তেমনি। জনসাধারণকে ভাঁওতা দেওয়াই ছিলো এমন গরম বুলির উদ্দেশ্য। আসলে হিটলার-মুসোলিনীকে সামনে রেখে রাজত্ব চালিয়েছে একচেটিয়া কোটিপতিরা। প্রমাণ? হিটলারের আমলে জার্মানির অর্থনীতি পরিচালনার জন্যে যে সর্বোচ্চ পরিষদ গঠন করা হয়েছিলো তার সদস্য ছিলো কে কে জানো? ছিলো যুদ্ধাস্ত্র শিল্পের একচেটিয়া মালিক ক্রুপ, ছিলো ইস্পাত শিল্পের একচেটিয়া মালিক থাইসেন ও ভুগলার, ছিলো বিদ্যুৎ শিল্পের একচেটিয়া মালিক সিমেনস্, রঙ শিল্পের একচেটিয়া মালিক বশ প্রভৃতি ১০

জন কোটিপতি। শুধু এই পাঁচজন কোটিপতিরই ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ ছিলো ২ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ৩৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু ৭ কোটিরও বেশি)। আর এদের কোম্পানিগুলির মূলধন ছিলো ২৬ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড।

এইভাবে ফ্যাশিস্ত শাসন কায়েম করে একচেটিয়া কোটিপতিরা সর্বপ্রথম আক্রমণ করলো শ্রমিক শ্রেণীকে, কারণ তাদের আন্দোলনের ফলে ইতালি ও জার্মানিতে পুঁজিবাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছিলো। স্বাভাবিক অবস্থায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন নানাভাবে দমন করার চেষ্টা হলেও তাদের সংগঠনগুলি সরাসরি ভেঙে দেওয়া হয় না বা তাদের ধর্মঘট করার অধিকারও আইন করে কেড়ে নেওয়া হয় না। কিন্তু মরণদশায় পড়ে পুঁজিবাদ যখন ফ্যাশিজমের আশ্রয় নেয় তখন শ্রমিক শ্রেণীর এই অধিকারগুলির ওপরই প্রথম আক্রমণ আসে। ইতালিতে ফ্যাশিস্ত সরকার শ্রমিক-কৃষকের সংগঠন-গুলি ভেঙে দিয়ে মিলমালিক ও জমিদারদের নেতৃত্বে করপোরেশন নামে কতগুলি সংগঠন গড়তো এবং শ্রমিক-কৃষকদের এই সব সংগঠনে জোর করে ঢুকিয়ে দিতো। ইতালিতে ধর্মঘট বেআইনী করা হলো এবং এইভাবে শ্রমিকদের নিরস্ত্র করে তাদের উপর শোষণের মাত্রা আরও চড়িয়ে দেওয়া হলো। লীগ অব নেশনের হিসাবেই প্রকাশ, ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ইতালির শ্রমিকদের মজুরি শতকরা ৪৮ থেকে ৫৫ ভাগ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। জার্মানির 'লেবার কোড'-এ নিয়ম করা হলো,

প্রত্যেক কারখানার মালিকই হবে সেই কারখানার নেতা এবং তারই নির্দেশে সেখানকার শ্রমিকদের চলতে হবে! এর ফলে শ্রমিকদের যে কী অবস্থা হলো তা সহজেই বোঝা যায়। সরকারী হিসাব অনুসারে ১৯৩২-এ জার্মানিতে সমস্ত শ্রমিকের মোট মজুরির বাৎসরিক পরিমাণ ছিলো ৬ কোটি ৫০ লক্ষ মার্ক। মাত্র দু-বছরের ফ্যাশিস্ত শাসনে তা কমে হয় ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ মার্ক। এই মজুরিও সবটা শ্রমিকরা পেতো না, কারণ নানা অছিলায় মালিকরা ও সরকার চাঁদার নাম করে মজুরির একটা বড়ো অংশ কেটে রাখতো।

এইভাবে শ্রমিকদের যতোদূর সম্ভব শোষণ করেও যখন ইতালি ও জার্মানিতে পুঁজিবাদের সমস্যা মিটলো না, তখন শুরু হলো যুদ্ধায়োজন। ইতালি আবিসিনিয়া আক্রণ করলো। হিটলার সমস্ত ইউরোপ গ্রাস করলো। সে যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা আজও তোমাদের মনে আছে।

এই হলো ফ্যাশিজম্—মরণদশায় পুঁজিবাদের শেষ অস্ত্র। নিজের দেশের মানুষকে যতোদূর সম্ভব শোষণ করে, অপরের দেশকে গ্রাস করে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদিম বর্বরতাকে ফিরিয়ে এনে ফ্যাশিজম্ পুঁজিবাদকে সংকট থেকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করে।

কিন্তু আপন সংকট থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে পুঁজিবাদের এই শেষ চেষ্টাও সফল হয়নি। ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাশিজম ধ্বংস হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের আরও ছটি দেশে লোপ পেয়েছে পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থা।

সমাজতন্ত্র

পুঁজিবাদী সমাজের অরাজকতা ও সংকটের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের তফাত কোথায় ?

আমরা দেখেছি, পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি হলো, উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার এবং ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যে সেই যন্ত্রগুলির ব্যবহার। পুঁজিবাদের যতোকিছু সংকট তার মূলও এখানে। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের এই মূল ভিত্তিটাই ভেঙে দেয়। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় উৎপাদন-যন্ত্রে সমাজের সকলের সমান অধিকার। কোনো ব্যক্তিবিশেষ বড়ো বড়ো উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক হতে পারে না, সমস্ত সমাজই সেখানে এই সব যন্ত্রের মালিক।

পুঁজিবাদী সমাজে পণ্য উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য মালিকদের মুনাফা বাড়ানো, জনসাধারণের অভাব মেটানো নয়। যে-পণ্য জনসাধারণের অত্যন্ত প্রয়োজন তাতে যদি তেমন লাভ না হয় তা হলে পুঁজিপতিরা সেই পণ্য উৎপাদন না করে করবে অন্য কিছু, যাতে লাভ হবে বেশি। যেমন, গত যুদ্ধের সময় দেশে যখন ভয়ানক কাপড়ের অভাব তখন এদেশের কাপড়ের কলের মালিকরা সস্তা দরের মোটা কাপড় বেশি করে তৈরি করতে কিছুতেই রাজী হলো না, কারণ তাতে মুনাফা কম। তার বদলে তারা বেশি করে তৈরি করলো চড়াদামের মিহি কাপড় এবং যুদ্ধের বাজারের ঠিকেদার ও চোরাকারবারীদের কাছে তা বিক্রি

করে মোটা মুনাফা লুটলো। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় মুনাফা বাড়াবার জন্যে পণ্য উৎপাদন হয় না। সেখানে পণ্য উৎপাদন হয় মানুষের অভাব মেটাবার জন্যে। জনসাধারণের প্রয়োজন বুঝে সেখানে পণ্য উৎপাদন হয়। উৎপাদন বাড়িয়ে জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নত করাই সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। ব্যক্তিগত লাভের জন্যে পণ্য উৎপাদন সেখানে সম্ভব নয়, কারণ যা দিয়ে পণ্য উৎপাদন হবে সেই যন্ত্রগুলির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সেখানে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু জনসাধারণের প্রয়োজন বুঝে উৎপাদন হবে কীভাবে? সমাজতন্ত্রী সোবিয়েত দেশের উৎপাদন-প্রণালীর উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে, কী করে জনসাধারণের প্রয়োজন বুঝে, জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নত করার জন্যে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা যায়।

॥ পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন ॥

সোবিয়েত ইউনিয়নে সর্বোচ্চ পরিষদের কয়েকজন প্রতিনিধি, কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এবং শ্রমিকদের কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এর নাম হলো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং কমিশন। রুশ ভাষায় সংক্ষেপে এই কমিশনকে বলে 'গস্‌প্লান'। পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে কোন পণ্য কতোটা উপাদন করা হবে, কোন শিল্পকে এবার বাড়াতে হবে, কোন দিকে বেশি নজর দিতে হবে ইত্যাদি সবকিছু এই কমিশন ঠিক করে।

কীভাবে?

প্রথমত, এই কমিশন হিসেব নেয় দেশে কতো কাঁচা মাল তৈরি হতে পারে, কতো শ্রমিক ও কতো এঞ্জিনিয়ার আছে, যে উৎপাদন-যন্ত্র হাতে আছে তার ক্ষমতা কতোখানি ইত্যাদি। তারপর তারা হিসেব নেয়, আগের বছর কোন জিনিস কতোটা তৈরি হয়েছিলো, কোন জিনিস লোকে বেশি চায়, কোনটার অভাব বেশি, কোনটার কম, আসছে বছর কোন জিনিসের বেশি প্রয়োজন এবং কতোটা প্রয়োজন ইত্যাদি। এইভাবে লোকের কোন জিনিসের কতোটা প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনমতো পণ্য তৈরির ক্ষমতা উৎপাদন-যন্ত্রের কতোখানি আছে তার একটা হিসাব নেওয়া হলো। এখন এই হিসাব অনুসারে ঠিক হবে কোন কারখানায় এবং কোন কৃষিফার্মে কতোটা জিনিস তৈরি হবে। আর ঠিক হবে, দেশের মোট উৎপাদন-শক্তির কতোখানি নিয়োজিত হবে জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র (যেমন, জামাকাপড়, জুতো, বাড়িঘর ইত্যাদি) তৈরি করতে, আর কতোখানি নিয়োজিত হবে উৎপাদন বাড়াবার জন্যে আরও বেশি ও নতুন উৎপাদন-যন্ত্র তৈরি করতে। এ ছাড়া, আরও ঠিক হবে, আগামী পাঁচ বছরে কোন বিদ্যায় কতো লোককে কতোখানি শিক্ষিত করা হবে, দেশে রোগ দূর করার জন্যে কী কী ব্যবস্থা হবে, জনসাধারণের বিশ্রাম ও আনন্দের জন্যে কী কী করা হবে ইত্যাদি।

এইভাবে তৈরি হলো একটা প্রাথমিক খসড়া প্ল্যান। সেই খসড়া প্ল্যান তখন পাঠানো হবে বিভিন্ন জেলা প্ল্যানিং কমিশনের

কাছে। তারা ঐ প্ল্যান খুঁটিয়ে আলোচনা করবে। দেখবে—তাদের যা তৈরি করতে বলা হয়েছে তারা তার বেশি তৈরি করতে পারে না কম পারে, তাদের সব চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা প্ল্যানে হয়েছে কিনা ইত্যাদি। এসব দেখে তারা তাদের মতামত-সহ খসড়াটি পাঠিয়ে দেবে জেলার সব কারখানা ও কৃষিফার্মে। সেখানেও শ্রমিক, ম্যানেজার, এঞ্জিনিয়ার, কৃষক প্রভৃতি সবাই মিলে এইভাবে আলোচনা করবে এবং আলোচনার পরে তাদের মতামত-সহ খসড়াটি আবার ফেরত পাঠাবে কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশনের কাছে। এরই সঙ্গে চলতে থাকে সারাদেশে সভা ও খবরের কাগজ মারফত প্ল্যান নিয়ে তুমুল আলোচনা।

এইসব আলোচনার শেষে খসড়া প্ল্যানটি যখন কেন্দ্রীয় কমিশনের কাছে ফিরে এলো তখন তারা সকলের মতামত বিচার করে মূল প্ল্যানের প্রয়োজনীয় অদলবদল করে এবং তারপর তা পেশ করা হয় সোবিয়েতের সর্বোচ্চ পরিষদের কাছে। পরিষদ তখন সেটা নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রয়োজন হলে কিছু অদলবদল করে সেটা পাশ করে দেয়। পরিষদে পাশ হবার পর দেশের যা-কিছু জিনিসপত্র সব তৈরি হয় সেই প্ল্যান অনুসারে।

পুঁজিবাদের সমর্থকেরা বলবে, এভাবে সব ছক কেটে দিলে মানুষের উৎপাদন ও ভোগের স্বাধীনতা রইলো কোথায়? তোমার হয়তো ইচ্ছে তুমি সিল্কের জামা পরবে, কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন হয়তো ঠিক করে দিলো সিল্কের কাপড়ই মোটে তৈরি হবে না। এ অবস্থায় তোমার ভোগের স্বাধীনতা থাকবে না।

কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে কি সকলের ভোগের স্বাধীনতা আছে? তুমি যদি গরিব হও তা হলে পুঁজিবাদী সমাজে চাইলেই কি তুমি সিল্কের জামা পরতে পারবে? পারবে না। পুঁজিবাদী সমাজে ভোগের স্বাধীনতা হচ্ছে বড়োলোকদের জন্যে, সাধারণ মানুষদের জন্যে নয়। তাই পুঁজিবাদী সমাজে ভোগের প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। সেই স্বাধীনতা আছে সমাজতন্ত্রী সমাজে। কারণ সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন হয় জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে, মালিকদের মুনাফা জোগাবার জন্যে নয়। আমরা দেখেছি সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্ল্যান তৈরি হয় জনসাধারণের মতামত নিয়ে। জনসাধারণের কোনো উল্লেখযোগ্য অংশ যদি সিল্কের জামা বেশি করে তৈরি করার পক্ষে মত দেয় তা হলে প্ল্যানে সিল্কের জামা তৈরির ব্যবস্থাও রাখা হবে এবং সেই তৈরি জামা কেনার পয়সাও সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের পকেটে থাকবে।

এরকম প্ল্যানে কী কখনও কোনো ভুল হতে পারে না?

খুবই পারে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় কোনো পণ্য বেশি তৈরি হলে অমনি সেই শিল্পে যেমন সংকট দেখা দেয় সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় তা হয় না। কারণ সেখানে প্রতি বছর নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য যে-পরিমাণ উৎপাদিত হয় তা কেনার মতো মজুরি ও বেতন জনসাধারণ পায়। কোনো বছর যদি হিসাবের ভুলে প্রয়োজনের তুলনায় কোনো পণ্য বেশি তৈরি হয় তা হলে পরবর্তী প্ল্যানে তা সংশোধন করে নেওয়া হয়। ধরো, এক বছর প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সাইকেল

তৈরি হলো, আর জুতো তৈরি হলো প্রয়োজনের চেয়ে কম। এরকম হলে পরের বছর সাইকেল কিছুটা কম তৈরি করে জুতো প্রয়োজন অনুযায়ী বেশি তৈরি করা হবে। এর ফলে ভুলের সংশোধন হবে, কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের মতো মোট উৎপাদন এতে করে কমবে না।

॥ সমাজতন্ত্রে পণ্যের বণ্টন ॥

সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে পণ্য উৎপাদন হয় বুঝলাম। কিন্তু সেই উৎপাদিত পণ্য যে সবাই কিনতে পারবে তার নিশ্চয়তা কী?

তার নিশ্চয়তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার বণ্টন-প্রথা।

পুঁজিবাদী সমাজে লোকের আয় হয় দুভাবে। এক হয় গতর বা মাথা খাটিয়ে। শ্রমিক, কেরানি, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতিরা এইভাবে গতর বা মাথা খাটিয়ে আয় করে। আর আয় হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে। জমিদার, মহাজন, ব্যাঙ্কার, মিলমালিক প্রভৃতি এইভাবে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে আয় করে। পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে আয় পরিশ্রম থেকে আয়ের চেয়ে অনেক বেশি, তাই পুঁজিবাদী সমাজে আমরা দেখি শ্রমিক বা খেটে-খাওয়া মধ্যবিত্তরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারছে না, আর জমিদার, ব্যাঙ্কার, মিলমালিকেরা কোনো পরিশ্রম না করেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাড়া খাটিয়ে দিব্যি আরামে আছে।

সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় আয়ের দ্বিতীয় উপায়টি বন্ধ করে দেওয়া

হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাড়া খাটিয়ে অন্যের পরিশ্রমের পয়সায় বাবুগিরি করা এখানে চলে না। সবাইকে এখানে খেটে খেতে হয়। গতর খাটিয়েই হোক, আর মাথা খাটিয়েই হোক, পরিশ্রম না করলে এখানে ভাত জুটবে না।

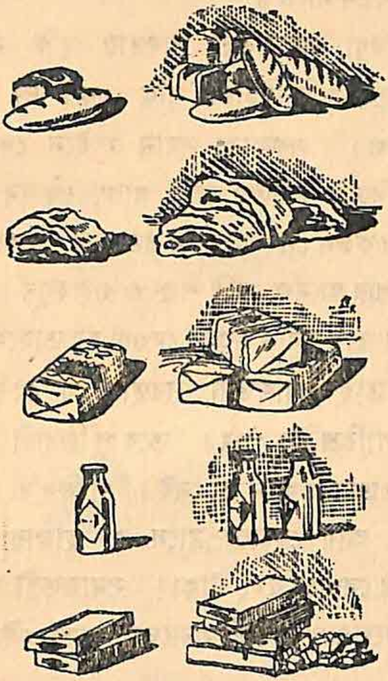
কিন্তু কাজ করতে চাইলেই কি কাজ পাওয়া যায়? পুঁজিবাদী সমাজে অবশ্য পাওয়া যায় না। সেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মক্ষম মানুষ বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় এরকম হবার উপায় নেই। কারণ, সেখানে উৎপাদন-যন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার থাকায় সকলেই সেই যন্ত্র ব্যবহার করে কিছু আয় করার অধিকারী। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রত্যেকটি নাগরিকের এই অধিকার রক্ষা করে। তাই সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় বেকার নেই। সেখানে সমস্যা বরং উল্টো। সেখানে উৎপাদন এতো দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে যে সব কাজের জন্যে যথেষ্ট লোক পাওয়া কষ্টকর।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় সবাই না হয় কাজ পেলো, কিন্তু সেই কাজের জন্যে সবাই কি এমন মজুরি ও বেতন পায় যা দিয়ে তারা তাদের প্রয়োজনমতো সব জিনিস কিনতে পারে?

হ্যাঁ, পায়। আমরা দেখেছি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একজন শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কাজ করলে ৪ ঘণ্টার পরিশ্রমের মূল্য মজুরি হিসেবে পায়, আর তার বাকী ৪ ঘণ্টার পরিশ্রমের ফল বাড়তি মূল্য হিসেবে মালিকের পকেটে যায়। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় উৎপাদন-যন্ত্রে কারু ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না বলে এখানে মজুর

খাটিয়ে কেউ বাড়তি মূল্যও আদায় করতে পারে না।

তাই এখানে শ্রমিক যা পরিশ্রম করে তার পুরো মূল্য সে পায়। তার পরিশ্রমের ফলে উৎপাদন যতো বাড়ে তার আয়ও ততো বাড়ে। কিন্তু শুধু নগদ টাকায় মজুরির হিসেব দিয়েই সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় একজন শ্রমিকের আয়ের প্রকৃত হিসেব করা যায় না। নগদ মজুরি ছাড়াও সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় একজন শ্রমিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে আরও অনেক সুবিধে পায় যার ফলে তার প্রকৃত আয় অনেক বেড়ে যায়। যেমন, সোবিয়েত ইউনিয়নে নগদ মজুরি ছাড়াও প্রত্যেক শ্রমিক সরকারী সামাজিক তহবিল থেকে নানা রকম সাহায্য পায়। বৃদ্ধ বয়সের জন্যে তাকে প্রতি মাসে মজুরি থেকে টাকা বাচাতে হয় না, কারণ বৃদ্ধ হলে রাষ্ট্রই তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। তার সন্তান হলে সন্তানদের জন্যে সে একটা ভাতা পায়। ১০ বছর পর্যন্ত সন্তানদের শিক্ষার জন্যে তাকে কোনো খরচা করতে হয় না এবং এর পরেও যা করতে হয় তাও খুব সামান্য। চিকিৎসার জন্যে তার একটি পয়সা খরচা নেই, আর ছুটির দিনে বেড়াতে গেলে সে খরচাও রাষ্ট্র বা তার ট্রেড ইউনিয়ন দেবে। এ ছাড়া আছে প্রতি বছর জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস। যুদ্ধের পর থেকে এখন পর্যন্ত সোবিয়েত দেশে সাত বার জিনিসপত্রের দাম কমানো হয়েছে। এই সব মিলিয়ে সোবিয়েত দেশে একজন শ্রমিকের আসল আয় তার নগদ মজুরির অনেক বেশি দাঁড়ায় এবং ফলে প্রয়োজনমতো জিনিস কেনার পয়সাও তার জোটে।



একই দামে

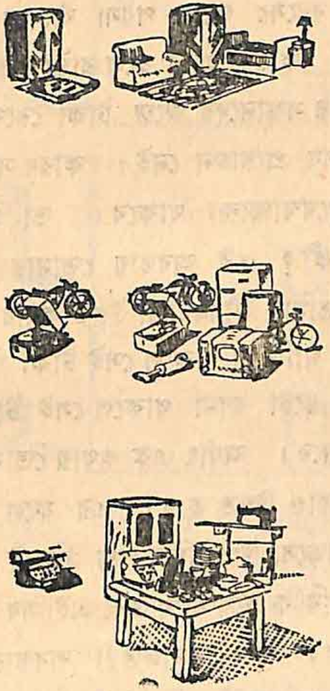
	১৯৪৭	১৯৫৩
রুটি	১	২·৮৫
মাংস	১	২·৮
মাখন	১	৩·০
দুধ	১	১·৩৯
চিনি	১	২·২৭

॥ সমাজতন্ত্রে বণ্টন-নীতি ॥

অনেকের ধারণা সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় বুঝি সকলের সমান মাইনে, সেখানে মুড়ি-মিছরির বুঝি একই দর। এই ধারণা একেবারেই ভুল। সকলকে সমান মাইনে দেওয়া সম্ভব নয়, আর তা ন্যায়বিচারে উচিতও নয়। ধরো, একজন শ্রমিক বয়লার বানায়, আর একজন সেই বয়লারে রঙ করে। বয়লার যে বানায় তার কাজ নিশ্চয় অনেক বেশি শক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ। তাকে যদি যে রঙ লাগায় তার সমান মজুরি দেওয়া হয় তাহলে সেটা অবিচার করা হবে। তাই সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় যে যে-রকম কাজ করে সে সে-রকম পারিশ্রমিক পায়। তবে পুঁজিবাদী সমাজে আয়ের যে বিরাট তারতম্য এখানে তা নেই। পুঁজিবাদী সমাজে একজন মিলমালিকের আয় যেখানে মাসে ৩০ হাজার টাকা, একজন শ্রমিকের আয় সেখানে ৫০৲ টাকা। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় আয়ের তারতম্য থাকলেও পুঁজিবাদী সমাজের মতো এই দুস্তর ব্যবধান নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় আয়ের যখন তারতম্য আছে তখন যাদের আয় বেশি তারা তো টাকা জমিয়ে ক্রমে আবার পুঁজিপতি হতে পারে।

এই ধারণাও ভুল। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় তোমার আয় থেকে তুমি টাকা জমাতে পারো। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে তুমি কোনো উৎপাদন-যন্ত্র কিনতে পারবে না। ফলে তোমার টাকা খাটিয়ে তুমি যে আবার পুঁজিপতি হবে সেই পথ বন্ধ। সুতরাং টাকা বাঁচিয়ে তুমি কী করবে? টাকা দিয়ে তুমি বড়ো জোর নিজের



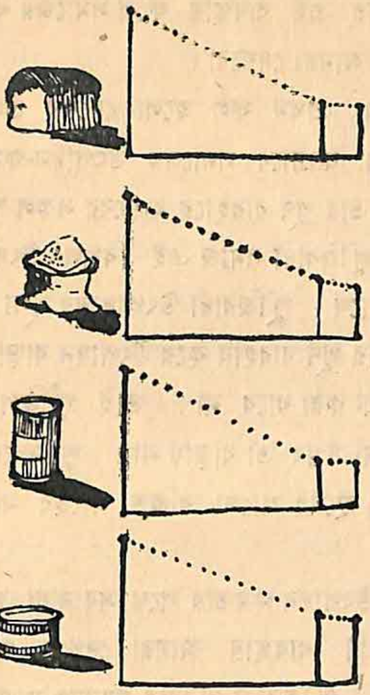
একই দামে

১৯৩৭—১৯৫৩

জন্যে একটা বাড়ি বানাতে পারো। কিন্তু তাতেও বা কতো খরচা হবে। কারণ বাড়ির জন্যে তুমি রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিনা পয়সায় জমি পাবে। কিন্তু সেই বাড়ি ভাড়া দিয়ে তুমি আয় করতে পারবে না, বাড়িতে তোমাকে নিজেকে থাকতে হবে। তারপর বুড়ো বয়সের জন্যে পয়সা বাঁচাবে—তারও বিশেষ প্রয়োজন নেই। কারণ বুড়ো হলে রাষ্ট্রই তোমার ভরণ-পোষণ করবে। তোমার সন্তানদের জন্যে টাকা রেখে যেতে পারো। কিন্তু তারও বিশেষ প্রয়োজন নেই। কারণ সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় তারাও বেশ সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। তা হলে তুমি পয়সা বাচিয়ে করবে কী? এই অবস্থায় তোমার আয়ের একমাত্র সদ্‌গতি হচ্ছে তোমার জীবনযাত্রা উন্নত করার জন্যে তা খরচা করা। তোমার গাড়ি না থাকলে সেই টাকা দিয়ে তুমি গাড়ি কিনবে, তোমার দুটো জামা থাকলে সেই টাকা দিয়ে আরও পাঁচটা জামা কিনবে। অর্থাৎ এক কথায় তোমার আয় বাড়লে তোমার জীবনযাত্রাও উন্নত হবে। এর ফলে আবার জিনিস-পত্রের বিক্রিও বাড়বে, উৎপাদিত পণ্য কিছুই অবিক্রীত পড়ে থাকবে না, সবই বিক্রি হয়ে যাবে এবং এই সব মিলিয়ে দেশের উৎপাদনও বাড়বে। তাই সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার লোকের আয় বৃদ্ধির ফলে নতুন করে পুঁজিপতির সৃষ্টি হয় না, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়।

॥ সমাজতন্ত্রের ফল—উৎপাদন বৃদ্ধি ॥

সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন কীভাবে হয় আমরা



পণ্যের উৎপাদন বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম কমছে। ওপরের নকশাটা দেখলে দাম কমার ব্যাপারটা বোঝা যাবে। রুটি, চিনি, টিনের মাংস আর মাখন, এই চারটি জিনিসের দাম ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৫২ আর তারপরে ১৯৫৩ সালে কতো নেমে গেছে দেখো। ১৯৪৭ সালের দামকে ১০০ ধরলে দাম কমেছে এই হারে :

রুটি : ('৫২) ৩৯, ('৫৩) ৩৫
চিনি : ('৫২) ৪২, ('৫৩) ৩৫
মাংস : ('৫২) ৩৭, ('৫৩) ৩৩
মাখন : ('৫২) ৪৯, ('৫৩) ৪৪

দেখেছি। এবার এই ব্যবস্থার ফলে সমাজের কী পরিবর্তন ও উন্নতি হয় তাই আমরা দেখবো।

সমাজতন্ত্রের প্রথম ফল হলো দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি। আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা এতোদূর বেড়ে গেছে যে তার পূর্ণ ব্যবহারে মানুষের সকল অভাব দূর করা সম্ভব। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ এই বিপুল উৎপাদন-ক্ষমতাকে সংকুচিত করে রাখে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল্য লক্ষ্য মুনাফা। উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ালে মোটা লাভ রেখে মাল বিক্রি করা যাবে না। তাই পুঁজিপতিরা উৎপাদন যতোদূর বাড়ানো সম্ভব তা বাড়ায় না। পুঁজিবাদী সমাজে তাই উৎপাদন-ক্ষমতা সূর্যের আলো বঞ্চিত গাছের মতোই সংকুচিত হয়ে আছে।

সমাজতন্ত্র উৎপাদন-ক্ষমতার পথে সব বাধা দূর করে দেয়। তাই সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই উৎপাদনের একটানা বৃদ্ধি। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো তিনটা দেশ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মোট পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সোবিয়েত দেশের উৎপাদনের তুলনা করলেই কথাটা আরও ভালো করে বোঝা যাবে।

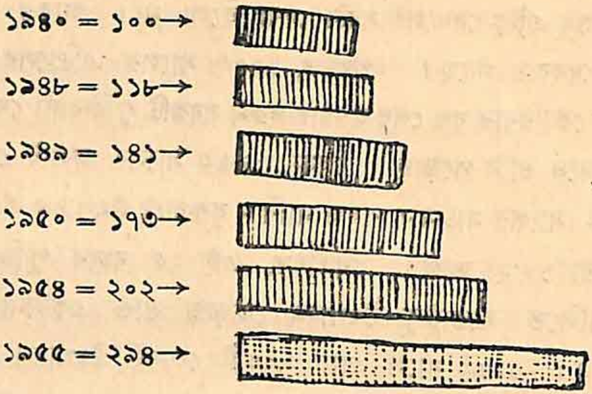
১৯২৯ থেকে ১৯৫৩ এই পঁচিশ বছরের হিসেব আমরা নিচ্ছি। ১৯২৯ সালে এই দেশগুলির মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ ইউনিট ধরলে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে : ফ্রান্সে ১০৮, বৃটেনে ১৬৬, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে ২১৪, আর সোবিয়েত দেশে ১৫১৫। অর্থাৎ এই পঁচিশ বছরে ফ্রান্সের

মোট উৎপাদন প্রায় বাড়েনি বললেই চলে; ব্রিটেনে বেড়েছে পৌনে দুগুণের কিছু কম; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে দ্বিগুণের কিছু বেশি; আর সোবিয়েত দেশে বেড়েছে ১৫ গুণেরও বেশি। কিন্তু শুধু এটুকু দেখলেই সবটা দেখা হলো না। আরও দুটো বিষয় দেখবার আছে। প্রথমত, ১৯৫৩ সালের এপ্রিলের পর থেকে কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হওয়ার দরুন সবকটি পুঁজিবাদী দেশেই উৎপাদনে ভাটা পড়েছে। যেমন, ১৯৫৩ সালের জুলাই থেকে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন কমেছে শতকরা ১০·২ ভাগ। দ্বিতীয়ত, এই ২৫ বছরে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যতোটুকু উৎপাদন বেড়েছে তাও একটানাভাবে বাড়েনি। ১৯৩৯ সালে প্রায় সবকটি দেশেই উৎপাদন কমে গিয়েছিলো। তারপর আবার কমে গিয়েছিলো ১৯৪৯ সালে। ১৯৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ লেগে যাওয়ায় পুঁজিবাদী দেশগুলি এই সংকট থেকে সাময়িকভাবে ত্রাণ পায়। অন্যদিকে সোবিয়েত দেশে উৎপাদন বেড়েছে একটানাভাবে। একমাত্র যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ফলে উৎপাদন দু-বছর সাময়িকভাবে কিছুটা পিছিয়ে ছিলো।

॥ সমাজতন্ত্রের ফল—বেকার সমস্যার সমাধান ॥

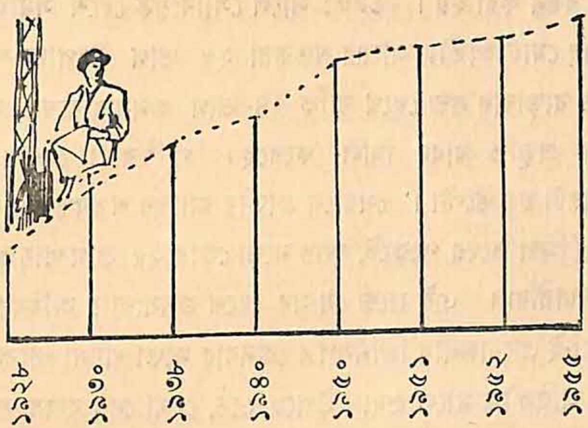
সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে প্ল্যানমাফিক সব পণ্য উৎপাদন হয় বলে এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যবসা-সংকট দেখা দিতে পারে না। এখানে ধনসম্পত্তি যা তৈরি হয় তার অল্প একটা অংশ দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা

সোবিয়েতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি



সোবিয়েত দেশে বছরের পর কলকারখানায় খনিতে কেমন তরতর করে উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে, ওপরের নকশাটা দেখলে তা আন্দাজ করা যায়। ১ম খামটা ১৯৪০ সালের, যুদ্ধের আগের অবস্থা। ১৯৪১ সালে হিটলার সোবিয়েত দেশ আক্রমণ করে। কলকারখানা ভেঙে খেতখামার জ্বালিয়ে দেশকে সে শ্মশান করে দিয়ে যায়। যুদ্ধের শেষে, ১৯৪৮ সাল থেকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সোবিয়েত দেশের মানুষ কী দ্রুতবেগে আবার নতুন করে দেশকে গড়ে তুলছে দেখো।

সোবিয়েত দেশে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি



যে দেশে কলকারখানা চালানোর উদ্দেশ্য সব মানুষের জীবনকে স্বচ্ছল সুখী আনন্দময় করে তোলা—সেদেশে কেউ বেকার বসে থাকে না ; সেদেশে কাজ করাটা আনন্দের জিনিস, নিজের শক্তিকে ফুটিয়ে তোলার উপায়। ওপরের নকশায় দেখো, সোবিয়েতে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কী দ্রুতবেগে বাড়ছে।

আরও বাড়াবার জন্যে রেখে বাকিটা জনসাধারণের মজুরি ও বেতন বাবদ বণ্টন করা হয়। ১৯৫১ সালে সোবিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রী সরকার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ২৬ ভাগ উৎপাদন-ক্ষমতা আরও বাড়াবার জন্য রেখে বাকি ৭৪ ভাগ জনসাধারণের মজুরি বেতন প্রভৃতি বাবদ বিলি করেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যাপারটা হয় উল্টো। সেখানে জাতীয় আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ যায় পুঁজিপতিদের পকেটে, আর বড়ো জোর ২৫ ভাগ পায় শ্রমিক ও কর্মচারীরা। এই জন্যে সে সব দেশে জনসংখ্যার অধিকাংশের পকেটেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনবার মতো পয়সা থাকে না। ফলে অবিক্রীত মালে গুদাম উপছে ওঠে, দেখা দেয় ব্যবসা-সংকট, বেকারসমস্যা, বিপুল জনসংখ্যার অনশন বা অর্ধাশন।

সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় মোট জাতীয় আয়ের অধিকাংশই যেহেতু পুঁজিপতিদের পকেটে না গিয়ে জনসাধারণের পকেটে যায় এবং উৎপাদন-বৃদ্ধির সমান অনুপাতে যেহেতু তাদের আয়ও বাড়ে সেই হেতু সমাজতন্ত্রী দেশে কখনও অবিক্রীত মালে বাজার বোঝাই হয়ে থাকে না। জিনিসপত্র তৈরি হতে না হতেই লোকে তা কিনে নেয়। এর ফলে সেখানে কখনও ব্যবসা-সংকট দেখা দেয় না, শ্রমিকরাও কখনও বেকার হয় না। পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সোবিয়েত দেশের তুলনা করলেই দুই ব্যবস্থার এই পার্থক্যটা চোখে পড়ে।

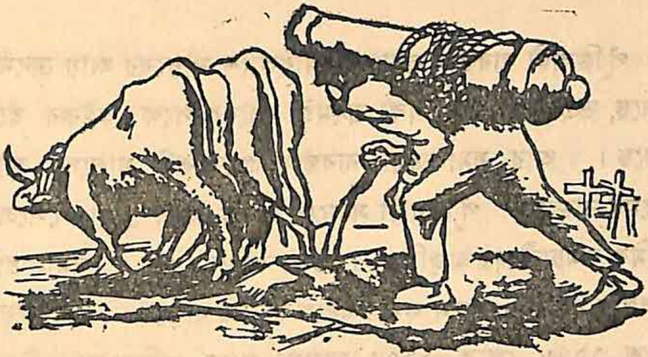
১৯২৯-৩৩ সালের ব্যবসা-সংকটে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যখন একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো, তখন সোবিয়েত দেশে কারখানাগুলি দিনরাত কাজ করেও জন-

সাধারণের চাহিদা মেটাতে পারছিলো না। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আজ বেকারের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। ১৯৪৮ সালে ইউ-রোপের ১২টি দেশে বেকারের সংখ্যা ছিলো মোট ২৯ লক্ষ ৫৯ হাজার। ১৯৫৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪৩ লক্ষ। ব্রিটেনে ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে বেকারের সংখ্যা ছিলো ৩ লক্ষ ২ হাজার। ঠিক এক বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৩ সালে বেকার ছিলো ৩৭ লক্ষ লোক। মনে রাখতে হবে, আংশিক সময়ের জন্যে যারা কাজে নিযুক্ত আছে বা সাময়িকভাবে যারা কাজ হারিয়েছে তাদের এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। এদের ধরলে বেকারের সংখ্যা প্রায় ডবল হয়ে যাবে। সমাজতন্ত্রী সোবিয়েত দেশে অবস্থাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেখানে প্রতিটি কর্মক্ষম মানুষ উৎপাদনের কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত।

॥ সমাজতন্ত্রের ফল—শান্তি ॥

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অবিক্রীত পণ্য বিক্রি করার জন্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি অপরের দেশ দখল করে এবং এই পররাজ্য গ্রাসের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় পণ্য অবিক্রীত হয়ে পড়ে থাকে না বলে সেই পণ্য বিক্রির জন্যে সমাজতন্ত্রী দেশগুলিকে পররাজ্য গ্রাস করতে হয় না। আর পররাজ্য গ্রাস করতে হয় না বলে যুদ্ধেরও কোনো প্রয়োজন তাদের হয় না। এই জন্যে পররাজ্য শোষণ ও যুদ্ধ বন্ধ করার স্থায়ী উপায় হচ্ছে সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রে যুদ্ধ-পরিকল্পনার কোনো স্থান নেই বলে যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্যে পুঁজিবাদী দেশগুলি যে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে সেই অর্থ সমাজতন্ত্রী দেশগুলি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে ব্যয় করতে পারে। আজ প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্যে ব্যয় হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। ব্রিটেনে গত বছর যুদ্ধ-খাতে ব্যয় হয়েছিলো ১৫১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড; এ বছর হয়েছে ১৬৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫১-৫২ সালে যুদ্ধ-খাতে ব্যয় হয়েছিলো ৪০০০ কোটি ডলার, এ বছর হয়েছে ৫৬০০ কোটি ডলার। গত যুদ্ধের সৈন্যদের পেনশন ইত্যাদি বাবদ খরচা ধরলে ১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ খাতে ব্যয় হয়েছে মোট রাজস্বের শতকরা ৮৭ ভাগ। আর একই বছর সোবিয়েত দেশে দেশরক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছে শতকরা ২০·৮ ভাগ। যুদ্ধের জন্যে প্রায় সব রাজস্ব খরচা হয়ে যায় বলে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে ব্যয় হয় নামমাত্র। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী দেশে রাজস্বের সর্ববৃহৎ অংশ ব্যয় হয় জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে। ১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক কল্যাণকর কাজে ব্যয় হয়েছে রাজস্বের মোট ৩·৭ ভাগ, আর সোবিয়েত দেশে হয়েছে ২৬·৩ ভাগ। একই বছর দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করেছে রাজস্বের শতকরা ২ ভাগ, আর সোবিয়েত দেশ করেছে শতকরা ৪৩·৯ ভাগ। যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্যে ১৯৫৩-৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে (৫৬০০ কোটি ডলার) তা সেখানকার জনসংখ্যার মধ্যে সমানভাবে



যুদ্ধের বোঝা বয় কে?

ভাগ করে দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক প্রায় ১৮ শত টাকা করে পেতে পারতো। এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে একদিকে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে খরচা কমিয়ে, অন্য-দিকে তাদের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে। ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনসাধারণের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা প্রতি দিনই বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণকে ১৯৩৭-৩৮ সালে যে পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হতো আজ তার চেয়ে ১২ গুণ বেশি ট্যাক্স দিতে হয়। অন্যদিকে সোবিয়েত দেশ এই বিরাট অপচয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে জনসাধারণের ওপর ট্যাক্স ক্রমেই কমাতে পারছে। সোবিয়েত দেশে ১৯৫১ সালে মোট রাজস্বের শতকরা ৯·৪ ভাগ জনসাধারণের দেয় ট্যাক্স থেকে আমদানি হতো। ১৯৫২ সালে এই ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ৯·৩ ভাগেরও কম হয়েছে।

॥ সমাজতন্ত্রের ফল—মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ॥

সমাজতন্ত্রের চতুর্থ ফল হলো মানুষের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি।

পঁুজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ মানুষের আয় ক্রমেই কমছে, ভদ্রভাবে বেঁচে থাকা ক্রমেই তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠছে। আর সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি মানুষের আয় ক্রমেই বাড়ছে। পঁুজিবাদী সমাজে ধনিক শ্রেণী সুযোগ পেলেই শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি ও বেতন কমিয়ে দেয়। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় মজুরি ও বেতন কমার বদলে ক্রমেই বাড়ছে। সোবিয়েত দেশে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি ও বেতন বেড়েছে দেড়গুণ। নগদ টাকায় মজুরি ও বেতন ছাড়াও সোবিয়েত দেশে শ্রমিক-কর্মচারীরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে আরও অনেক রকম ভাতা পায়। (কী কী ধরনের ভাতা তারা পায় তা আগেই বলা হয়েছে)। ১৯৪০ সালে এই সব ভাতা বাবদ তারা পেয়েছিলো ৪০৮০ কোটি রুবল। ১৯৫৩ সালে এই ভাতার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১২৯৮০ কোটি রুবল। অর্থাৎ নগদ মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি ছাড়াও ১৩ বছরে তাদের ভাতা বেড়েছে ৪৯০০ কোটি রুবল। পঁুজিবাদী দেশগুলিতে জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বাড়ছে। ফলে জনসাধারণের প্রকৃত আয়, অর্থাৎ ক্রয়-ক্ষমতা, ক্রমেই কমছে। অন্যদিকে সোবিয়েত দেশে জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই কমছে এবং তার ফলে জনসাধারণের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যও বাড়ছে। মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য খাদ্যদ্রব্যের বেলায় দুই সমাজ-ব্যবস্থায় দামের এই পার্থক্যটা আরও বেশি। যেমন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে সোবিয়েত দেশে রুটির দাম কমেছে শতকরা ৬১ ভাগ, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে ২৮ ভাগ, ব্রিটেনে বেড়েছে ৯০ ভাগ। এই একই

সময়ে দুধের দাম সোবিয়েত দেশে কমেছে শতকরা ২৮ ভাগ, আর মার্কিন দেশে বেড়েছে ১৮ ভাগ, ব্রিটেনে বেড়েছে ৩০ ভাগ। মাংসের দাম সোবিয়েতে কমেছে শতকরা ৫৮ ভাগ, আর মার্কিন দেশে বেড়েছে ২৬ ভাগ, ব্রিটেনে ৩৫ ভাগ। চিনির দাম সোবিয়েতে কমেছে শতকরা ৫১ ভাগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়েছে ২৬ ভাগ, ব্রিটেনে ১৩৩ ভাগ। মাখনের দাম সোবিয়েতে কমেছে শতকরা ৬৩ ভাগ, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে বেড়েছে যথাক্রমে ৪ ও ১২৫ ভাগ। পুঁজিবাদী দেশে যেখানে জনসাধারণের দারিদ্র্য বাড়ছে, সেখানে সমাজতন্ত্রী সোবিয়েত দেশে মজুরি, বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি এবং মূল্যহ্রাসের ফলে ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে প্রত্যেকের আয় শতকরা ৬৮ ভাগ বেড়েছে।

শুধু আর্থিক দিক দিয়েই নয়, সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও সমাজতন্ত্র মানুষের জীবনকে উন্নত করে তুলছে। পুঁজিবাদী সমাজে অধিকাংশ মানুষই পয়সার অভাবে শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ পায় না। ফলে বহু প্রতিভাবান ছেলের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিন্নেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির রিপোর্টে দেখা যায়, সেখানে ১৬ থেকে ২৫ বছরের ২ কোটি ১৫ লক্ষ ছেলেমেয়ের মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ কলেজে ও ২০ লক্ষ স্কুলে পড়ে। আরও ২০ লক্ষ চাকরি করে। বাকি ১ কোটি ৬৫ লক্ষ স্কুলকলেজে পড়েও না, চাকরিও করে না।

কিন্তু সমাজতন্ত্রী সোবিয়েত দেশে অবস্থাটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেখানে স্কুলে পড়বার বয়সের কোনো ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছে না, এরকম ঘটনা দেখা যায় না। কারণ, সেখানে লেখাপড়া

শেখাবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে সেখানে রাষ্ট্রের খরচায় লেখাপড়া শেখে। উচ্চ শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয়ও রাষ্ট্রই বহন করে। এ ছাড়া কারখানা, অফিস বা কৃষিফার্মে যারা কাজ করে তাদের বিনা খরচায় কারিগরি বা এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থাও আছে। শিক্ষার এই অবাধ সুযোগের ফলে প্রত্যেকেই সেখানে নিজ নিজ প্রতিভা বা বিশেষ ক্ষমতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে, পুঁজিবাদী সমাজের মতো প্রতিভার অপচয় সেখানে হয় না।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে এই হলো মূল প্রভেদ। পুঁজিবাদের মূল লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা। এই সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্যে পুঁজিপতিরা স্বদেশের জনসাধারণকে নিঃশেষে শোষণ করে, অপরের দেশকে পদানত করে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়।

অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য সমগ্র সমাজের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার সর্বাধিক পরিতৃপ্তি।

একদিকে মানুষের সর্বাধিক শোষণ, অপর দিকে মানুষের অভাবের সর্বাধিক পরিতৃপ্তি—পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের এই দুই আদর্শ আজ পাশাপাশি চলছে। শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ আজ আপন সংকটের চাপে ভেঙে পড়ছে। অন্যদিকে শোষণহীন সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা রূপান্তরিত হতে চলেছে উন্নততর কমিউনিষ্ট সমাজে।



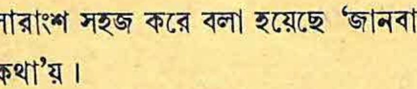
জানবার কথা শিখতে তো ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। তাহলে আবার 'জানবার কথা' কেন?

একটা সাদামাটা জবাব আছে।

ইস্কুলের বই ছাড়াও ছেলেমেয়েরা আরো কিছু কিছু বই পড়তে চায়। পড়েও। ইস্কুলেও পড়ে, ইস্কুলের বাইরেও পড়ে।

আমরা ইস্কুলের আঙিনার বাইরেই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসর জমাতে চেয়েছি। এ-আসরে বোঝা না-বোঝার সঙ্গে পাস-ফেলের সম্পর্ক নেই। ওরা তাই সহজ হয়ে শুনছে, আমরাও সহজ করে বলছি।

বিদেশী বুক অফ নলেজ ধরনের বই-গুলির মতো 'জানবার কথা' প্রধানতই পাতা উলটে ছবি দেখবার বই নয়। ছবির বই আর পড়বার বই— দুইই। এতো হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ যে-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পেয়েছে তারই সারাংশ সহজ করে বলা হয়েছে 'জানবার কথা'য়।



সম্পাদিত

১০ খণ্ডের তালিকা

এক ॥ বিজ্ঞান
দুই ॥ ইতিহাস
তিন ॥ ইতিহাস
চার ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
পাঁচ ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
ছয় ॥ পৃথিবীর খবর
সাত ॥ অর্থনীতি-রাজনীতি
আট ॥ সাহিত্য
নয় ॥ চারুশিল্প
দশ ॥ দর্শন